আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার পঞ্চবিংশ গ্রন্থ

রসির ডায়ারী

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী

ফাল্গুন, ১৩২৪

রসির ডায়ারি

(আমি রসি। আমার ভাল নাম রসি, অন্য নাম মুখ-পোড়া, হারামজাদা, পাজী, শুয়ার, উল্লুক ইত্যাদি। আমি জাতিতে ফক্সটেরিয়ার, আমার একটি কান কালো, সেই জন্য আমি ধরা-খানাকে সরার মত দেখি।)

সোমবার।

সকাল—৫টা।

সকালবেলা কাকের ডাকের চোটে একটু ঘুমাইবার যো নাই, শেষ-রাত্রিতে উঠিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে; আমি যে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বাড়ী চৌকি দিয়া মরিয়াছি, সে কথাটা একবার ভাবেও না। বেটাদের যদি একবার মুখের কাছে পাই, ত মজা দেখাইয়া দি। এখনও কেহ উঠে নাই, ভাবিয়াছিলাম এই ফাঁকে একটু ঘুমাইয়া লইব; কিন্তু তাহা আর হইল না দেখিতেছি।

৭টা।

লবা-বেটা উঠিয়াছে দেখিয়া বৈঠকখানার তক্তাপোষের নীচে একটু শুইয়াছিলাম, কিন্তু ছোটদাদার ছেলেটা লেজ ধরিয়া এমন টান দিয়াছে যে, সে রাগ সামলাইতে না পারিয়া তাহার হাতে এক ছোবল বসাইয়া দিয়াছি; অদৃষ্টে নিতান্তই প্রহার আছে দেখিতেছি।

এই লবা-বেটার এত স্পর্দ্ধা আমার সহ্য হয় না। আমি কর্ত্তা বাবুর কুকুর, আর সে কর্ত্তাবাবুর চাকর। বড়দাদাবাবু কতদিন বলিয়াছেন,"চাকরে আর কুকুরে তফাৎ কি?" তা'র উপর আমি খাস বিলাতী এলবিয়মের পুত্র, আর সে বেটা ড্যাম্ নিগার। আমার মনিব যদিও নিগার, তবু ত তাঁহার রংটা ফরসা আছে! আর লবা-বেটার গায়ে যেন আল্কাত্রা মাখান'। বাবু আমাকে 'রসি' বলিয়া আদর করিয়া ডাকেন, গিন্নী পোড়ারমুখো বলেন, দাদাবাবুরা হারামজাদা, পাজী, শুয়ার, উল্লুক বলে বলিয়া লবা-বেটাও কি তাই বলিবে? যদি ছোটদাদাবাবুর চাবুকের ভয় না থাকিত, তাহা হইলে বেটাকে ছিঁড়িয়া টুক্রা-টুক্রা করিয়া দিতাম। মোট কথা, কালা-আদ্‌মি এখনও খাস বিলাতী কুকুর পুষিবার যোগ্য হয় নাই।

মানুষের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে। প্রথম শ্রেণীর লোক কুকুর দেখিলে ডরায়, তাহাদিগকে আমরা বড় ঘৃণা

করি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আমাদের ভালবাসে, আদর করে, আমরাও তাহাদের ভালবাসি। আমার বাবুর বাড়ী অনেক রকমের অনেক লোক আসে; কেহ বা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া আসে, কেহ বা হাওয়াগাড়ীতে চড়িয়া আসে, আবার কেহ বা হাঁটিয়া আসে। ইহাদের মধ্যে আমরা কেবল ঐ উপরের দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এই সকল বাহিরের লোকের মধ্যে আমি একজনকে বড়ই ভালবাসি, সে আমার মনিবের দূর সম্পর্কের ভাইপো। সে বেচারি বড় ভালমানুষ। লোকটা যদিও মোটা, বেঁটে, কালো; কিন্তু লবাবেটার চাইতে কালো নয়। সে নিতান্তই গরীব; কারণ, আমার মনিব কখনই গরীব মানুষের সঙ্গে কথা কহেন না।

আমার মনিব-বাড়ীতে কতকগুলি বাঁধা-নিয়ম আছে। কার অথবা জুড়ি চড়িয়া আসিলে, বাবু তাহাকে বসিতে বলেন এবং লবাকে তামাক সাজিয়া দিতে হুকুম করেন। তাহারা আসিলে বাবু সন্তুষ্ট হন। আমি বাবুর পায়ের তলায় বসিয়া থাকি কিনা, সেইজন্য সমস্ত দেখিতে পাই ও বুঝিতে পারি। এক-ঘোড়ার গাড়ী অথবা ভাড়াটিয়া গাড়ী চড়িয়া আসিলে লোকে বেঞ্চিতে বসিতে পায়, কিন্তু তামাক পায় না; ইহারা চেয়ারে বসিলে বাবু ভারি বিরক্ত হন। যাহারা হাঁটিয়া আসে, তাহাদের অভ্যর্থনাও হয় না, তাহারা বসিতেও পায় না।

তাহারা বসিয়া পড়িলে, বড়বাবুর যে বড় অপমান! অতিথি-অভ্যাগত কখনও আমাদের বাড়ীতে আসে না, আসিলেও স্থান পায় না; তবে জনকতক লোক চির-অতিথির মত আসিয়া সংসারে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। তাহারা নাকি দাদাবাবুদের মামারবাড়ীর দেশের লোক। দাদাবাবুদের মামা বাঁচিয়া আছেন, তিনি যদি কখনও আসেন, তাহা হইলে দুই-একদিনের বেশী থাকেন না; কিন্তু ইহারা যেন আর নড়িতেই চায় না।

একবার সেই বাবুর ভাইপোটী আমাদের বাড়ীতে থাকিতে আসিয়াছিল। তখন আমার সঙ্গে তাহার বড়ই ঘনিষ্টতা হইয়াছিল। সে আমাদেরই মত একপাশে চুপ্-চাপ্ পড়িয়া থাকিত এবং দু'বেলা দুই-মুঠা খাইতে পাইত। তখন আমার মনিবের ভগিনী-পতি কিছুকালের জন্য তাঁহার আতিথ্য-স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বড় বৈঠকখানায় শয়ন করিতেন এবং ঘরে অন্য কেহ থাকিলে তাঁহার নিদ্রা হয় না বলিয়া সেখানে আর কেহ শুইতে পাইত না। ভাইপো-বেচারি দিনকতক উঠানে এবং গাড়ী-বারান্দায় শুইয়া অবশেষে—ঘেউ!

বিড়ালটা কথা শেষ করিতে দিল না। ঐ যে কালো বিড়ালটি দেখিতেছ, উহাকে দেখিলে আমি বেজায় চটিয়া যাই। উহার একশোটি করিয়া বোধ হয় চারিশো পা আর প্রতি

পায়ে হাজারটি করিয়া নখ আছে। আমরা তিনজনে তিনদিক হইতে আক্রমণ করিয়াও উহার কিছুই করিতে পারি নাই। আমাদের নাকে, মুখে ও চোখে সেই যুদ্ধের কত ভীষণ চিহ্ন এখনও দেখিতে পাইবে। তথাপি, এখনও উহাকে দেখিলে আমি আক্রমণ না করিয়া থাকিতে পারি না।

৮টা।

ঐ দেখ, সেই লোকটি আসিতেছে। সে বড়-একটা আমার মনিবের নিকটে আসেনা। যখন আসে, তখন দুয়ারের এক-পাশে দাঁড়াইয়া থাকে এবং অপর কাহাকেও দিয়া কর্ত্তাবাবুকে তাহার উদ্দেশ্য জানাইয়া চলিয়া যায়। নিমন্ত্রণের সময়ে প্রায়ই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়া যায়। যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগকে কখনই আমার প্রভু-গৃহে নিমন্ত্রণ করা হয় না; কেবল এই লোকটার সহিত কিছু সম্পর্ক আছে বলিয়াই বোধ করি ইহাকে বলা হয় যে, নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।

১০টা।

ঐ যে পেট-মোটা লোকটি আসিতেছে, উহাকে দেখিলে হাড় যেন জ্বলিয়া যায়! উহার মত মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর মানুষ, এ পর্য্যন্ত আমি আর দেখি নাই। লোকটা নাকি দূর সম্পর্কে আমাদের কর্ত্তাবাবুর ভাই হয়। ঐ লোকটা যখনই আসে, তখনই একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা করে, দেশশুদ্ধ সকল

লোকের নিন্দা করে, এবং বিশ্বজগতের মধ্যে তাহার মত ভাল-মানুষ যে আর কেহই নাই, ইহাই বার-বার করিয়া বলিতে থাকে।

আমার বন্ধুটিকে অর্থাৎ বাবুর ভাইপোটিকে এই লোকটা মোটে দেখিতে পারে না। সেদিন কি বলিতেছিল জান ? বলে "বিষ নাই, কুলোপানা চক্র। পয়সা নাই, ভিক্ষা করিয়া খায়, তবু অহঙ্কারে মাটিতে যেন পা পড়ে না। লেখা-পড়া শিখিয়াছে ত মাথা কিনিয়াছে, এখন কি আর লেখা-পড়ার কোন দাম আছে ? বি, এ পাশ করিলে মাসে ত্রিশ টাকা মাহিনা হয় না, তাহার জন্য এত অহঙ্কার কেন বাপু ? আপনি দেশের মাথা, দশজনের মুরুব্বি, কতলোক আপনার সংসারে মানুষ হয়, সে কি একবার দিনান্তে আপনার দুয়ারে হাজির হইতে পারে না ?"

লোকটার ঘ্রাণ-শক্তি অদ্ভুত, কতকটা আমাদের সারমেয়-জাতির মত। যেদিন আমার মনিব-বাড়ীতে সমারোহ-ব্যাপার থাকে, সেদিন সে গন্ধে-গন্ধে ঠিক আসিয়া হাজির হয়। ভাই-পোটিকে প্রতিবারই নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়া যায়।

ঐ শুন, আবার কি বলিতেছে। তাহারই নিন্দা করিতেছে আর কি ? লোকটার কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান একেবারেই নাই। একবার বাবুকে খোসামোদ করিবার জন্য বলিয়াছিল যে,

তাহার আপন ভাইয়ের মেয়ে কুলটা। সেখানে এক বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য বসিয়াছিল, সে রাগিয়া উঠিয়া এমন দু'-চার কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিল যে, দুই-তিন দিনের মধ্যে লোকটা আর আমাদের বাড়ীতে চক্ষুলজ্জার খাতিরে মাথা গলাইতে ভরসা করে নাই।

মনটা আজ বড়ই খারাপ। ছোটদাদাবাবুর সঙ্গে গাড়ীতে চড়িয়া রোজ হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া মেজাজটা একদম বিগড়াইয়া গিয়াছে, দেখিতেছি। আজ আর যাওয়া হইবে না, কারণ তাঁহার অসুখ করিয়াছে। এ বাড়ীর চাকর-বাকর বড়ই অভদ্র, আদবকায়দা কিছুই জানে না। আমি দুয়ারে বসিয়া আছি দেখিয়া ঝি-বেটী বলে কি না, "আয় রসি, বেড়াতে যাবি?" দেখদেখি একবার আস্পর্দ্ধা! আমি কি না তা'র সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে যাইব? আমি রসি, খাস বিলাতি, আমি গাড়ী চড়িয়া ছোটদাদাবাবুর সঙ্গে গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে যাই, আর সেই আমি কি না, এক বেটী ঝির সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া রাস্তায় বেড়াইতে যাইব? আমি রাগে তিনটা হইয়া ফুলিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যা ৬টা।

মনটা বড় খারাপ, ছোটদাদাবাবু আজ আর নামিবেন না। সন্ধ্যা হইতে বড়দাদাবাবু পাশার আসর জমাইয়া বসিয়া-

ছেন। কর্ত্তাবাবু নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, গোলমালে ঘুম হইতেছে না।

রাত্রি ৮টা।

আমার বন্ধু আসিয়া অপরাধীর মত বৈঠকখানার এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে, কেহ একবার বসিতেও বলিল না। আমি উঠিয়া গিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার হাত চাটিয়া দিলাম, তিনি হাসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

আধঘণ্টা পরে একদফা খেলা হইয়া গেলে, বকুলবাবু (দাদাবাবুদের বহু দূর সম্পর্কের মামাত ভাই) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, হাবু যে!"

তিনি ধীরে ধীরে বড়দাদাবাবুকে বলিলেন, "দাদা, মেয়েরা নিমন্ত্রণে গেছে, আমি আজ আপনার এখানে খাব।"

বড়দাদাবাবু অম্লান বদনে বলিলেন, "তাই ত ভাই, আমাদের যে আজ খাওয়া দাওয়া হ'য়ে গেছে, হাঁড়ী উঠে গেছে, বামুন ঠাকুরও চ'লে গেছে।"

আমি ত অবাক্! রাত্রি একটার কমে এ বাড়ীতে হাঁড়ী উঠে না,—এখনও বোধ হয় রান্না চড়ে নাই। তিনি দুই-পাঁচ মিনিট হেঁট্‌মুখে চুপ্‌টি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষটা অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা হো-হো হাসির রোল উঠিল। আমি কুকুর, বড়লোকের ব্যবহারে

আমি পর্য্যন্ত মরমে মরিয়া গেলাম, ল্যাজ গুটাইয়া লজ্জায় চৌকির নীচে গিয়া লুকাইলাম।

মঙ্গলবার।

সকাল ৬টা।

শরীরটা বড়ই খারাপ, মাথা তুলিতে পারিতেছি না, নাক দিয়া এখনও রক্ত পড়িতেছে। তাই কি ছোটদাদাবাবু ভাল আছেন যে, ধোয়াইয়া ঔষধ বাঁধিয়া দিবেন! কাল রাত্রি তিনটার সময় একটা ভয়ানক গোলমাল শুনিয়া কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, কাহারা যেন সারি দিয়া রান্নাঘরে চলিয়াছে। পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইলাম। দেখি, সামনেই কালো বিড়ালের মত মস্তবড় একটা জীব। দেখিয়াই আমার গা জ্বলিয়া গেল। আমি ভাবিলাম, ভগবান্ আমার শত্রু-নিপাতের বড় সুযোগই জুটাইয়া দিয়াছেন। এক লাফে তাহার উপর পড়িয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিলাম। তাহাকে ধরিয়াই কিন্তু বুঝিতে পারিলাম এ ত বিড়াল নয়, এ একটা মস্ত ইঁদুর। ইঁদুরটা ডাকিয়া উঠিল, আমিও তাহার ঘাড়টা ভাঙ্গিয়া দিলাম। ইঁদুরগুলাও হটিবার পাত্র নয়—দলে ভারি কিনা! কিন্তু সেই সময়ে হাজার হাজার বড় বড় হাতীর মত ইঁদুর আমাকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিল। কি করি? যেটাকে ধরিয়াছিলাম সেটাকে বুদ্ধিমানের মত

ছাড়িয়া দিয়া মহাবিক্রমে লড়াই সুরু করিলাম। চারিদিক্ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুর আসিয়া আমাকে কামড়াইতে লাগিল। দুই-দশটা মারিলাম বটে, কিন্তু অবশেষে একটা আমার নাক, আর একটা আমার লেজ কামড়াইয়া ধরিল ; অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিলাম, কিন্তু তাহাদিগকে কিছুতেই ছাড়াইতে পারিলাম না। নাক আর লেজ আমাদের বড় নরম জায়গা—তাই ত, কি করি ? প্রাণ যে যায় ! প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে, কাপুরুষের মত চীৎকার করিব না, কিন্তু শেষটা আর থাকিতে পারিলাম না, প্রাণের দায়ে চেঁচাইয়া উঠিলাম। সকলের আগে লবা বেটা জাগিয়া উঠিল ; কিন্তু সে বেটা ড্যাম-নিগার, ভয়ানক কাপুরুষ। সে ঘরের ভিতরে থাকিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, "দরওয়ান্-জি, দরওয়ান্-জি, চোর আয়া, ডাকু আয়া।"

দরওয়ান্ জির 'বলিয়া' জেলায় ঘর, মস্ত কুস্তীগির জওয়ান্, একবেলায় একসের আটা এবং আধসের 'ঘিউ' খাইতে পারে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় যে একটি লোটা 'ভাং পিয়ে', তাহার ঘুম কি সহজে ভাঙ্গে ?

লবা, বিছানায় শুইয়া শুইয়া ষাঁড়ের মত চেঁচাইতে লাগিল, "দরওয়ান্-জি, ভয়ানক ডাকু আয়া, রসি অনেকক্ষণ থেকে ভয়ানক চেঁচাতা হায়, তোম্ শিগ্গীর ওঠ। নাহলে হাম্লোককো সব মেরে ফ্যাক্গা।"

তাহার চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর অনেক লোক জাগিয়া উঠিল।

বিম্‌লি-ঝি, ঘরে দুয়ার দিয়া তারস্বরে বলিয়া উঠিল,"অগো কর্ত্তাবাবু, গেনু গো গেনু, মনু গো মনু, ডাকাত পড়েছে গো, এখুনি ওপরে এসবে !"

এইবার অন্দরে কর্ত্তাবাবুর ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি ডাকিলেন, "পাঁড়ে !"

মনিবের গলার আওয়াজ পাইয়া পাঁড়েজীর নেশা কাটিল এবং ঘুমও ভাঙ্গিল। তিনি লাঠি হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিলেন, "হুজুর, আভি আতা হ্যায়, আরে এ মিশির !"

মিশ্র মহাশয় রাত্রি বারটার সময়ে উদ্দি চড়াইয়া বড়-দাদাবাবুর সঙ্গে স্নিগ্ধ নৈশ সমীরণ সেবন করিতে বাহির হইয়াছিলেন; সুতরাং উত্তর দিবে কে ? যাক্, এতক্ষণে আমার নাকটা বাঁচিল, গোলমাল শুনিয়া অন্য ইঁদুরগুলো পলাইয়াছিল, আর পাঁড়েজির বাজ্‌খাই গলার মিঠা আওয়াজ শুনিয়া লেজের দিকের ইঁদুরটাও রণে ভঙ্গ দিতে গেল; আমিত তা'কে এক থাবা মারিয়া নাকে কামড়ের শোধ সুদে আসলে তুলিলাম। পাঁড়ে, লাঠি লইয়া আসিয়া আলো জ্বালিল। আমি তখন বারটি ইঁদুর মারিয়া দেমাকে ডগমগ হইয়া লেজ নাড়িতেছি ও নাক চাটিতেছি। বেটা ছাতুখোর ভোজপুরী কিনা! হাসিয়াই

আকুল, আমার বীরত্ব তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিল না, বরং বেটা আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া যেন আহ্লাদে আট খানা। এমন রাগ হইতেছিল যে, কি আর বলিব। একবার মনে হইল, বেটার পায়ে দি এক কামড়! কিন্তু বেটার হাতে যে তেল্‌চক্‌চকে লাঠি!

লবা-বেটা এতক্ষণে উঠিয়া আসিল, আমার দশা দেখিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

কর্ত্তাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাঁড়ে কেয়া হ্যায় রে?"

পাঁড়েজি হাসি সামলাইতে গিয়া তিনবার বিষম খাইয়া বলিল, "হুজুর—মুসা—!"

গিন্নীর হুকুমমত বিম্‌লি জিজ্ঞাসা করিল, "ও ঠাকুর, মুসা কি? কাবুলী নাকি?"

পাঁড়েজি আকর্ণবিশ্রান্ত দশন-পংক্তি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "নেহি নেহি, কুছ ডর্ নেহি, কাবুলী নেহি হ্যায়, মুসা। রসিনে দশ বার গো বড়া বড়া মুসা মারা।"

এইবার বিম্‌লি চটিল; সে বলিল, "আ মর্ মুখপোড়া, মুসা কি তাই জিজ্ঞেস্থচ্ছি। তোর ছাতুখোরের হঁকড়ি-মিকড়ি ছাড়্ না, মুসা কি? হতভাগার যেমন রূপ তেমনি গুণ, আর তেমনি মিষ্টি কথা কি গা! মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন।"

"এ বিম্‌লি—মুসা হ্যায়—ইয়ে হিন্দুর হিন্দুর—বড়া ভারি ভারি হিন্দুর!"

"তাই বল্‌না যমে-খেগো! তবে ডাকাত ডাকাত করে চেঁচিয়ে পাড়া মাত্ কর্‌ছিলি কেন?"

"হাম্ নেহি বিম্‌লি, হাম নেহি। ইয়ে লবা ডাকু ডাকু বোল্‌কে চিল্লাতা থা।"

"যেমন লবা, তেমনি তুমি। বাবারে বাবা!"

বিম্‌লি ঘুমাইল, পাড়া জুড়াইল। আমিও ঘুমাইলাম। শেষ-রাত্রিতে লবা-বেটা উঠিয়া বড়দাদাকে দুয়ার খুলিয়া দিল, তা'ও ঘুম-চোখে দেখিলাম। সকল গায়ে বেদনা।

বেলা ৮টা।

লবা বলিল, "ছোটদাদাবাবুর অসুখ বড় বাড়িয়াছে।" তিনি আজিও নামিবেন না; সুতরাং চাটিয়া চাটিয়াই নাকের ঘা সারাইতে হইবে। আজ আর খাইতে পারিব না, দেহ-মন বড়ই খারাপ।

বেলা ৩টা।

আজ বড় চুপ্-চাপ্, ছোটদাদাবাবুর অসুখ বড় সাঙ্ঘাতিক, গাড়ীগাড়ী ডাক্তার আসিতেছে। কর্ত্তাবাবুর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে, বিম্‌লির গলা চড়িতেছে না, লবা বাজারে চুরি করিতে ভুলিয়াছে। মনের দুঃখে সমস্তটি দিন আমিও

কিছু খাই নাই। ছোট-বৌমা একবাটি দুধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তা'ও ছুঁই নাই।

সন্ধ্যা ৬টা।

আজ নূতন মজা দেখিতেছি। দাদাবাবুদের মামার বাড়ীর সম্পর্কে যে যে এখানে থাকিত, তাহারা সুড়্ সুড়্ করিয়া সরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যাপারখানা যে কি, বুঝিতে পারিলাম না। রাম, সূর্য্য, হরি প্রভৃতি দাদাবাবুদের মামাত' ভাই সকলেই চম্পট দিয়াছে। রাম বলিল, তাহার ভা'য়ের বড় শক্ত ব্যায়রাম, সূর্য্যের মা মারা গিয়াছেন সংবাদ আসিয়াছে, হরির বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে, অন্য পুরুষ-মানুষ কেহ নাই, অতএব সকলকেই আজ যাইতে হইবে।

রাত্রি ৮টা।

ছোটদাদাবাবুর অবস্থা বড় খারাপ, ডাক্তার আসিয়া বসিয়া আছেন। লবা আসিয়া আমাকে খুলিয়া দিল, কিন্তু আমার আজ আর বাহিরে যাইতে মন সরিল না, ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিলাম, আজ আর আমাকে কেহ বারণ করিল না। ছোটদাদাবাবুর ঘরে আলো জ্বলিতেছে; ডাক্তারবাবু, আর বড়দাদাবাবু বসিয়া আছেন। ছোটদাদাবাবু অজ্ঞান হইয়া বিছানায় শুইয়া। ঘরের বাহিরের দুয়ারে গিন্নী-মা আর ছোট-বউদিদি বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছেন। বৌদিদির কাছে গিয়া

লেজ নাড়িলাম, হাত চাটিলাম, কিন্তু আজ বোধ হয় তিনি আর আমাকে চিনিতে পারিলেন না। মুখখানি ভার করিয়া চৌকীর নীচে ঢুকিয়া বসিয়া রহিলাম।

* * *

কাল রাতটা যে ভাবে কাটিয়াছে, তাহাতে আর বোধ হয় না যে আজিকার দিনটা কাটিবে। বড়ই কঠিন পীড়া, ভয়ানক সংক্রামক, ডাক্তার রোগীকে স্পর্শ করিয়া প্রত্যেকবার ঔষধে হাত ধুইতেছে। বড়দাদাবাবুর সুখের শরীর কিনা! অনিদ্রায় তাই তাঁহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিয়াছে; বসিয়া বসিয়া তিনি ঢুলিতেছেন। গিন্নী-মা ও ছোট-বৌদিদির চোখে শুধু ঘুম নাই, আমারও তাই। বারান্দায় বসিয়া বসিয়া লবা ও বিমলি ঘুমাইতেছে।

এমন সময়ে একটি পরিচিত মূর্ত্তি আসিয়া ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল। তিনি সেই! আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তিনি আর এ বাড়ীতে ছায়াও মাড়াইবেন না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া লেজ নাড়িয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং গিন্নী-মাকে বলিলেন, "কাকী-মা, আমাকে কি একটা খবরও দিতে নেই?"

গিন্নী-মা উত্তর দিলেন না, চোখের জলে তাঁহার বুক

ভাসিয়া যাইতেছিল। তিনি খাটের উপর উঠিয়া বসিলেন এবং বড়বাবুকে ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পর কয়দিন যে কোথা দিয়া দিন কাটিয়া গেল এবং কখন রাত্রি আসিল, আমি তাহা জানিতেও পারি নাই। আমিও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া খাটের নীচে বসিয়া রহিলাম। তিনি আর সেই ডাক্তার, ছোটদাদাবাবুকে লইয়া বসিয়া রহিলেন। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, তাঁহারা মরণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই কালো বিড়ালটা নিত্য দুই তিনবার আমার দুয়ারের সম্মুখ দিয়া যাইত আসিত, রাত্রিতে ছোট বড় অনেকগুলা ইন্দুর ঘরের ভিতরে খেলা করিত; এমন কি, একদিন একটা দেশী নেড়ী কুত্তাও সাহসে ভর করিয়া উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আমি কাহাকেও কিছু বলি নাই; কেবল ছোটদাদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া এককোণে পড়িয়া থাকিতাম। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, শমনের দূত সেই রোগ-শয্যার চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ মুখখানির উপরে মাঝে মাঝে তাহাদেরই ছায়া পড়িতেছে। সেখানে যাহারা ছিল, তাহারা মৃত্যুর কবল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমি বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম।

একদিন শেষ রাত্রিতে তাঁহার পাণ্ডুবর্ণ মুখখানি নীলবর্ণ হইয়া গেল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আর অধিকক্ষণ নহে। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইব। এখন হইতেই রোগীর দেহের গন্ধ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, আর রক্ষা নাই। ছোটদাদাবাবু আর কখনও হাতে করিয়া আমাকে ভাত মাখিয়া খাওয়াইবেন না, গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইবেন না, অপরাধ করিলে মারিবেন না, এবারের মত এই শেষ। যদি জগতের পরে জগৎ থাকে, আর কুকুরের যদি সেখানে প্রবেশাধিকার থাকে, তবেই--

আর কি? শেষ—এই শেষ! রোগীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারের হাত কাঁপিয়া উঠিল, তাপমান যন্ত্র পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, ঔষধ মাটিতে পড়িয়া গেল! নীরোদবাবু ঔষধ লইয়া মুখে ঢালিয়া দিলেন, তাহা গড়াইয়া পড়িয়া গেল, তিনি মস্তকে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আবার তিনি উঠিলেন, ডাক্তারকে কি জিজ্ঞাসা করিয়া একটা পিচ্‌কারিতে ঔষধ লইয়া তা'র ছুঁচের মত মুখটা বুকের পাশে বিঁধিয়া দিলেন। যন্ত্রণায় রোগীর মুখ বিকৃত হইল!

* * *

ঔষধের আশ্চর্য্য ফল হইল, রোগীর বিকার কাটিয়া গেল, ধীরে ধীরে দেহের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসিল। ডাক্তারের

মুখে হাসি ফুটিল, আনন্দে আমার বুকখানা সাতহাত হইয়া উঠিল!

ছোটদাদাবাবু ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্রমে দেহে বল হইল, চেতনা ফিরিল। একদিন ছোটদাদাবাবু বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন, আমি লেজ নাড়িতে নাড়িতে স্বশরীরে যেন স্বর্গে চলিয়া গেলাম!

তাহার পর কখন যে সেই পরিচিত মূর্ত্তি সেবা-শুশ্রূষা সারিয়া, রোগীকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই।

মঙ্গলবার।
বেলা ৩টা।

আবার আসিয়া জুটিয়াছে,—নির্লজ্জ, বেহায়া, তীর্থ-কাকের দল আবার আসিয়া জুটিয়াছে! ছোটদাদাবাবু পথ্য করিবার দুই দিন আগে হইতে কর্ত্তাবাবুর রাম, হরি, সূর্য্য আবার আসিয়া জুটিয়াছে! সূর্য্যের মা মরে নাই, বেশ আছে। হরির বাড়ীতে চুরি হয় নাই; সে বলিল, পার্শ্বের বাড়ীতে হইয়াছিল, কিন্তু তা'ও সত্য কি না, সন্দেহ। রামের ভাই তখন বাড়ী ছিল না, হাওয়া খাইতে পশ্চিমে গিয়াছিল; সুতরাং সে ভালই ছিল।

আজ অমাবস্যা। দাদাবাবুর মানসিক কালীপূজা। সকাল হইতে ঢাক-ঢোল বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে, ডাকিয়া ডাকিয়া আমার গলাটা ভাঙ্গিয়া গেল। আজ রামবাবু, হরিবাবু আর সূর্য্যবাবুর লাফালাফি দেখে কে? তাহারাই যেন ছোটদাদা-বাবুকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে! নীরোদবাবুর রাত্রি জাগিয়া জ্বর হইয়াছে, তিনি মাথা তুলিতে পারিতেছেন না।

সন্ধ্যা ৬টা।

গিরিশবাবু মদ খান বটে, কিন্তু বড় মন-খোলসা লোক। আমাদের বড়ই ভালবাসেন। তিনি চাকরীর খাতিরে বিদেশে গিয়াছিলেন, সেইজন্য ছোটদাদাবাবুর অসুখের সময় একদিনও আসিতে পারেন নাই। গিরিশবাবু যে রকম বোলচাল দিতে সুরু করিয়াছেন, তাহা আর কি বলিব? তাঁহার বচনের চোটে রাম, সূর্য্য ও হরির মরমে মরিয়া যাইবারই কথা; কিন্তু ইহাদের যদি একটু চক্ষুলজ্জা থাকে! থাকিলে, এতক্ষণ বাড়ী ছাড়িয়া পলাইবার পথ খুঁজিয়া পাইত না!

সূর্য্য এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি তাহার মা কয়বার মরিলেন, তাহার হিসাব দিতে আরম্ভ করিয়া গিরিশবাবু হাসাইয়া হাসাইয়া লোকের পেটে খিল ধরাইয়া দিলেন। তিনি রামকে বলিলেন যে, তাহার বাড়ীতে নিশ্চয়ই বহু ধন-দৌলত আছে, তাহা না হইলে এত ঘন ঘন চুরি হইবে কেন? সুতরাং

এক্ষেত্রে তাহার বিদেশে পড়িয়া থাকা একেবারেই উচিত নহে। হরি ছয়মাস পূর্ব্বে বাড়ী ত্যাগ করিবার সময় লাঠি মারিয়া ভা'য়ের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল;' সুতরাং অকস্মাৎ তাহার এই বিচিত্র-ভ্রাতৃ-স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠা বড়ই বিস্ময়কর!

অনেক লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, প্রায় সকলেই আসিয়াছে; কিন্তু কৈ, তিনি ত আসেন নাই! আমি সমস্ত বাড়ীটা ঘুরিয়া ছোটদাদাবাবুর ঘরে আসিলাম। সব অপমান ভুলিয়া যিনি দিনরাত মুখ বুজিয়া ছোটদাদাবাবুর সেবা করিয়াছিলেন, আমি আজ এই আনন্দের দিনে সেই নিরানন্দের বন্ধুকে ত কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না! ছোটদাদাবাবু কত আদর করিলেন, আমি লেজ নাড়িলাম, দুই পায়ে ভর দিয়া তাঁহার জানুর উপরে উঠিলাম। তিনি আসেন নাই, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাই নাই, বারবার আমার আপন ভাষায় তাঁ'কে এই কথা বলিলাম; কিন্তু ছোটদাদাবাবু ত বুঝিতে পারিলেন না! আমরা সব বুঝিতে পারি, কিন্তু মনের ভাব ত প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না!

রাত্রি ১০টা।

এত লোক, একটা পাঁঠা, সুতরাং আমাদের জন্য একখানা হাড়ও বোধ হয় পড়িয়া থাকিবে না। একবার একবার

এই ভাবিতেছি, আর একবার একবার দুয়ারে গিয়া দেখিতেছি, তিনি এখনও আসিলেন কি না।

সকলে খাইতে যাইতেছে। এমন সময় গিরিশবাবু হঠাৎ বড়দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁগো বড়বাবু, হাবু যে এলনা?"

বড়দাদাবাবু বলিলেন, "তাই ত কাকা, হাবুকে বলিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।"

হুঁ,—সে যে নিরানন্দের বন্ধু! এ যে আনন্দের দিন!

ওস্তাদজি

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেখিয়া অবধি আমার ধারণা হইয়াছিল যে, ওস্তাদজি বড় যে-সে লোক নয়। তিনি যে বড়ঘরাণা, তাহা তাঁহার পোষাক, চালচলন দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত। পাণ্ডা দুর্গাপ্রসাদ বলিয়াছিল যে, সেতারে সিদ্ধহস্ত এমন ওস্তাদ আর নাই। তবে লোকটির মতিস্থির নাই; কখনও কখনও আসে, আবার না বলিয়া কহিয়া কোথায় চলিয়া যায়। দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের কাশীর পাণ্ডা দুর্গাপ্রসাদ বড় সুন্দর সেতার বাজাইতে পারে। আমরা একদিন তাঁহার বাড়ীতে সেতার শুনিতে গিয়াছিলাম; সেইদিন সেখানে ওস্তাদজির সঙ্গে প্রথম দেখা হইয়াছিল। পাণ্ডার বৈঠকায় একটি বৃদ্ধ মুসলমান শাদা পোষাক আর শাদা টুপী পরিয়া বসিয়া ছিলেন;—তিনিই ওস্তাদজি।

দুর্গাপ্রসাদ ভাল সেতার বাজাইতে পারেন, সারা বেনারস সহরে তাঁহার সুখ্যাতি। তিনি চারি-পাঁচবার বাজাই-বার পরে সকলে মিলিয়া অনুরোধ করিয়া ওস্তাদজির হাতে সেতার দিল; তিনি বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সেদিন দুর্গাপ্রসাদের বৈঠকায় কাশীর অনেক ভাল ভাল ওস্তাদের আগমন হইয়াছিল। বৃদ্ধের বাদ্য আরম্ভ হইলে সকলের কথা বন্ধ হইয়া গেল, ওস্তাদেরা সম্মুখে সরিয়া আসিল।

দুর্গাপ্রসাদ ভাল বাজাইতে পারেন বটে, কিন্তু ওস্তাদজির বাজনা অন্য রকম। তাহার শীর্ণ অঙ্গুলিগুলির মৃদুস্পর্শে তারের ভিতর হইতে যেন আর একরকম সুর বাহির হইল। তেমন সুর আর কখনও শুনি নাই, আর কখনও শুনিব কি না, জানি না। কতদিন হইয়া গেছে, সে সুর আজিও কাণে লাগিয়া আছে!

সেইদিন আমার স্বামীর সাধ হইল, আমাকে সেতার শিখাইবেন। দুর্গাপ্রসাদ পাণ্ডা দুর্গাবাড়ীর পায়স-প্রসাদ হইতে বাসন-মাজা মজুরণী পর্য্যন্ত সমস্তই আনিয়া যোগাইতেন। তাঁহারই উপর ওস্তাদ আনিবার ফরমাইস হইল। দেখিলাম সে ওস্তাদ সেই বৃদ্ধ!

ওস্তাদ আসিল, সেতার আসিল, বাঁয়া তবলা আসিল। আমি শিখিতাম, আমার স্বামী বসিয়া শুনিতেন। কিন্তু

অধিক সময় ওস্তাদজি বাজাইতেন, তিনি সঙ্গত করিতেন; আর আমি মন্ত্রমুগ্ধার মত বসিয়া থাকিতাম। বলা বাহুল্য যে, আমার সেতার-শিক্ষা দ্রুতপদে অগ্রসর হয় নাই।

আমার ধারণা ছিল যে, ওস্তাদজি মুসলমান। কথাবার্ত্তা, চালচলন, পোষাকআশাক, এমন কি চেহারাটি পর্য্যন্ত তাঁহার মুসলমানের মত। সেদিন কি যেন একটা ব্যাপার ছিল, বাড়ীতে গাওনাবাজনার মজলিস হইবে। সকালবেলায় ওস্তাদজি আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ওস্তাদজি, আপনি কি হিন্দুর তৈয়ারি খাবার খাইবেন?" একবার লক্ষ্ণৌতে এক মৌলবী হিন্দুর তৈয়ারি মিঠাই ফেরত দিয়াছিল; সেই অবধি তিনি জিজ্ঞাসা না করিয়া মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করেন না। ওস্তাদজি আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু সাহেব, কেন খাইব না? আমি কি মুসলমান?" তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ওস্তাদজি, আপনি তবে কি?" উত্তর হইল "আমি হিন্দু, গৌড় ব্রাহ্মণ।"

আমরা অনেক দিন পঞ্জাবে আর পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু এমন লম্বাদাড়ি, বাবরিচুল, তাহাতে মেহেদি মাখানো, চুড়িদার পায়জামা আর চাপকান পরা গৌড়-ব্রাহ্মণ আমরা আর কখনও দেখি নাই।

সেতার শিখিতে লাগিলাম, "দা—দেরে—দারা" আর "দ্রিম—দ্রিম" শুনিতে শুনিতে কান কালা হইয়া গেল। ক্রমে এক একখানা করিয়া পাঁচসাতখানা গৎ শিখিয়া ফেলিলাম—ইমন, ঝিঁঝিঁট, পূরবী, সিন্ধু, পরজ। ক্রমে হাত দোরস্ত হইল; কিন্তু আমার মন যেমনটি বাজাইতে চাহিত, তেমনটি ত পারিতাম না। যে সুর সদাই আমার কাণে বাজিত, তাহা আমার মেজরাপ্ দিয়া বাহির হইত না। কেবল ওস্তাদজি আসিয়া যখন তাঁহার পুরানো সেতারটীর উপর দিয়া কম্পিত হস্তে বিদ্যুদ্বেগে অঙ্গুলিচালনা করিয়া যাইতেন, তখনই সেই সুর জন্মিত।

ওস্তাদজির নিজের একটি সেতার ছিল। সেটি এত বড় যে, তাহা প্রথম দেখিয়া আমি তানপুরা মনে করিয়াছিলাম। সেটা সেতার, আর সুর-বাহারের মাঝামাঝি। ওস্তাদজি যখন সেইটা বাজাইতেন, তখন আমরা দুইজনে তন্ময় হইয়া শুনিতাম। প্রতিদিন আমার সেতারশিক্ষা হইত পনের-মিনিট; কিন্তু আমরা ওস্তাদজির বাজনা শুনিতাম—একঘণ্টা দুইঘণ্টা; সুতরাং ছয়মাস পরে, আমি দেখিলাম যে মোটে সাতটি গৎ শিখিয়াছি!

ছয়মাস পরে একদিন ওস্তাদজি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন। একমাসের বেতন ফেলিয়া, বাসায় তৈজসপত্র, চাল-ডাল,

কাপড় চোপড় ফেলিয়া—ওস্তাদজি, কেবল সেই সেতারটি লইয়া নিরুদ্দেশ হইলেন! একদিন গেল, দুইদিন গেল; আমি নিত্যই ভাবিতাম ওস্তাদজি আসিবেন। একমাস গেল—ওস্তাদজির কথা ক্রমে ভুলিয়া গেলাম।

ওস্তাদজি যেদিন নিরুদ্দেশ হইলেন, তাহার আগের দিন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। সেদিন আমার বসিবার ঘর রং হইতেছিল বলিয়া আমরা ভিতরের দিকে ছেলেদের ঘরে গিয়া বসিলাম। তখন কেবল টুনি হইয়াছে। টুনি বাবুর ঘরে নাই, এমন জিনিস নাই; সে যেখানে যাহা পায়, কুড়াইয়া লইয়া আসে; এবং 'দাই' যদি তাহা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর রাগিয়া ঠোঁট ফুলাইতে ফুলাইতে আমার কাছে নালিশ করিতে আসে। তাঁহার ছবি তুলিবার বাতিক ছিল—এখনও অল্পবিস্তর আছে। তিনি যখন যেখানে বদ্‌লি হইতেন, ফটোগ্রাফের রাশি রাশি কালো কাচ সঙ্গে লইয়া যাইতেন; আর যে যখন দেশবিদেশের ছবি চাহিত, তাহাকেই তুলিয়া দিতেন। তিনি যখন ছবি ছাপিতেন, তখন প্রায়ই দুইচারিখানা নষ্ট হইয়া যাইত। টুনি সেই-গুলি জমাদারের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আপনার ঘরে জমা করিত।

ওস্তাদজি বসিলেন, আমরা বসিলাম; বাবু সেতারের

সুর বাঁধিতে লাগিলেন। টুনিবাবু ঘরের এক কোণের একটা টিনের ভাঙ্গা পেটারা হইতে একরাশি ধূলাকাদা-মাখা ছবি বাহির করিয়া ওস্তাদজিকে দেখাইতে বসিল। একখানা ছবি দেখিয়া ওস্তাদজি চমকিয়া উঠিলেন; সেটা একটা পুরাণো ভাঙ্গা গোর! তিনি টুনিকে বলিলেন, "ববুয়া ছবি খানি আমাকে দিবে?" টুনিবাবুর কি সুমতি হইল, সে বলিল—হাঁ দিব।" ওস্তাদজি ছবিখানা হাতে লইলেন; তাঁহার শীর্ণ হাতদুখানি কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল; আমরা আশ্চর্য্য হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "ওস্তাদজি, একখানা ভাল ছবি দেখিবেন?" ওস্তাদজি মাথা নাড়িলেন। তিনি একখানা 'য়্যাল্‌বম্‌' আনিয়া দিলেন, বৃদ্ধ এক মনে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ ওস্তাদজি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন—"কা'ল আসিব।"

সে কা'ল আজিও আসে নাই। যাইবার সময়ে বৃদ্ধ একহাতে টুনির সেই ময়লা ছবিখানি, আর একহাতে সেতারটি লইয়া চলিয়া গেলেন। সেদিন আমাদের সেলাম করিতেও ভুলিয়া গেলেন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন কথায় কথায় আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ওস্তাদজি যে ছবিখানা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন, সে খানা কিসের ছবি? তিনি বলিয়াছিলেন যে, ছবিখানা লক্ষ্ণৌ হইতে উণাও যাইবার পথে একটি গোরের। তাঁহারা শিকার করিতে গিয়া পথে এক "পড়াও"তে তাম্বু ফেলিয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। সেই পড়াওয়ের কাছে নদীতীরে একটি সুন্দর পাথরের ছত্রি আছে। ছত্রির নীচে একটি শাদা-পাথরের গোর আছে। গোরের উপরে পারসীতে কেবল একটি কবিতা লেখা আছে; নাম বা তারিখ কিছুই নাই। কবিতাটির অর্থ এই; "হে পথিক! জগতে তুমি যদি শান্তি পাইয়া থাক, তাহা হইলে একবার গোরের উপরে চরণ স্থাপন করিও, আমি চির-অশান্তি লইয়া জীবনের পথে ঘুরিয়াছি, তোমার পাদস্পর্শে জুড়াইব।" তিনি বলিলেন যে, কবিতাটি বড় সুন্দর; সেই জন্য গোরটির ছবি তুলিয়াছিলেন। ছত্রিটা তখন জঙ্গলে ভরিয়া গেছে, কবরের উপরেও অনেক আগাছা জন্মিয়াছে।

অনেকদিন পরে বাবু লক্ষ্ণৌ বদলি হইলেন। আমাদের

বিবাহ হইবার পূর্ব্বে তিনি সব প্রথমে চাকরি পাইয়া লক্ষ্ণৌ আসিয়াছিলেন। তাহার পর, দশ বৎসর পরে আবার লক্ষ্ণৌ আসিলেন। আমিও আসিলাম। প্রথম দিনকতক মনের সাধে দিলখুসা, সেকেন্দ্রাবাগ, কৈশরবাগ, মছলিভবন, সাদৎজঙ্গের কবর, প্রভৃতি দ্রষ্টব্যগুলা দেখিয়া বেড়াই-লাম। যখন নগরীর তামাসা পুরাতন হইয়া গেল, তখন একদিন তাঁহাকে সেই গোরস্থানে লইয়া যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলাম। কিছু দিন পরে তিনি রাজি হইলেন। আমরা এক-দিন প্রভাতে উঠিয়া উণাওয়ের পথ ধরিয়া যাত্রা করিলাম।

তখন কাণপুরের রেল হইয়াছে; কিন্তু প্রথমবার তিনি যখন গিয়াছিলেন, তখন একায় চড়িয়াই কাণপুরে যাইতে হইয়াছিল। পথ চিনিতে পারিবেন না বলিয়া, তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

আঁকাবাঁকা সহরের পথ ছাড়িয়া কাণপুরের সোজারাস্তা ধরিয়া চলিলাম। সে পথ বে-মেরামত, এখন আর তাহাতে তত লোক চলে না। রাস্তার উপরে ঘাস গজাইয়াছে, পথ জনশূন্য, মাঝে মাঝে এক একখানা গরুর-গাড়ী আসিতেছে, যাইতেছে। বড়ই আনন্দে চলিতে লাগিলাম। পথে ঘোড়ার গাড়ী চলিতেছে; আশেপাশে আমবনের মধ্যে যে সকল গ্রাম লুকাইয়া আছে, তাহা হইতে বালকবালিকাগণ

গাড়ী দেখিতে পথের ধারে দৌড়াইয়া আসিতেছে! মাঝে মাঝে দূরে, রেলের পথে রেলগাড়ী যাইতেছে।

দুইপ্রহর বেলায়, পথের ধারে, একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-গাছের তলায় গাড়ী দাঁড়াইল। অশ্বত্থের তলে একটি নূতন শিবমন্দির এবং তাহার পার্শ্বে একটি নূতন কূপ। গাড়ী-ওয়ান বলিল "এই সেই পড়াও।" এই সেই পড়াও!—বাবু কিন্তু তাহা চিনিতে পারিলেন না। সেখানে যে দুইতিন ঘর লোকের বাস ছিল, রাস্তায় লোকচলা বন্ধ হওয়ায় তাহারা উঠিয়া গিয়াছে। পথ হইতে অনেক দূরে, রেলের ধারে নূতন গ্রাম বসিয়াছে। কেবল পুরাতন দেবস্থানটির আর পুরাতন কূপটির জীর্ণদশা গিয়া নূতনদশা হইয়াছে।

আমরা সেই অশ্বত্থ-তলে আশ্রয় লইলাম। ক্ষণেকপরে সেই নদীতীরের 'ছত্রি'র সন্ধানে বাহির হইলাম। ছোট নদীটি দিগন্ত-বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহারই তীরে, শিবমন্দির হইতে দূরে 'ছত্রি'টি দাঁড়াইয়া আছে। এখন তাহা নদীর দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, যেন ক্ষুদ্রকায় নদীর স্বচ্ছক্ষীণ অঙ্গে কোনও তরুণী আপনার নবযৌবনপুষ্পিত-দেহের প্রতিবিম্ব দেখিতেছে।

প্রাণ জুড়াইল। এমন স্নিগ্ধ, এমন শান্ত, এমন সুন্দর

স্থান কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। নদীতীরে 'ছত্রি'র ছায়ায় বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ বসিয়া ছিলাম, মনে নাই। ক্ষণেকপরে দেখি, একজন কৃষক নদীতীরে দাঁড়াইয়া আমাদিগের দিকে চাহিয়া আছে; আমাদিগকে মুখ তুলিয়া চাহিতে দেখিয়া সে চলিয়া গেল। আমরা তখন 'ছত্রি' দেখিতে উপরে উঠিলাম।

বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের একপার্শে একটি ছোট টিবির উপরে 'ছত্রি'টি দাঁড়াইয়া আছে। ছবিতে দেখিয়াছিলাম যে, তাহার উপরে এবং চারিপাশে জঙ্গল; কিন্তু এখন তাহার চারিদিক্ বেশ পরিষ্কার। টিবির উপরে আবাদ হয় না। কে যেন তাহা একটি সুন্দর বাগানে পরিণত করিয়াছে। সারি সারি বেল, যুঁই, চামেলি, আর রজনীগন্ধার গাছ; যুঁই আর চামেলি, মাটিতে লতাইয়া পড়িয়াছে। 'ছত্রি'তে গাছপালা কিছুই নাই, তবে নদীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়ায় ছাদের পাথর-গুলি সরিয়া পড়িয়াছে। 'ছত্রি'র ভিতরে শাদা-পাথরের একটি গোর। তাহাতে নকসা বা বাহার কিছুই নাই, কেবল সুন্দর ছোট ছোট অক্ষরে পারসীতে দুইছত্র লেখা আছে। তিনি তাহা পড়িলেন—বড় মিষ্ট!

কে তুমি চিরজীবন অশান্তিতে কাটাইয়া গিয়াছ? একদিনের তরেও কি শান্তি পাও নাই? সেইজন্যই এই জন-

শূন্য প্রান্তরে, শান্তস্নিগ্ধ নদীতীরে শেষশয্যা গ্রহণ করিয়াছ? হে অশান্ত! জীবনের পারে অশান্তির স্মৃতিকণাটুকুও স্পর্শ করিতে চাহ না; তাই পরিচয় গোপন করিয়াছ? কে তোমায় মৃত্যু-শীতল বক্ষের উপরে শুভ্র-মর্ম্মরের বেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, আর তাহার উপরে ছায়ার জন্য পাষাণের ছত্র উন্নত করিয়াছিল?

'ছত্রি'র ভিতরে রাশিরাশি শুষ্ক ফুল, আর মালা; তাহা ছাড়া কণামাত্রও আবর্জ্জনা নাই। অজ্ঞাত! কে তোমার শুভ্রমর্ম্মর-সমাধির উপরে শুভ্র-পুষ্পরাশির মালা সাজাইয়া রাখে? কে তোমার শেষশয্যাপার্শ্বে অমল-ধবল কুসুম-রাশির চয়নক্ষেত্র করিয়া গিয়াছে? কে সে? সে তোমার কে? তুমি কত দিন চলিয়া গিয়াছ? সে কি আজিও তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে?

'ছত্রি'র মধ্যে সহসা মনুষ্যের ছায়া পড়িল; আমরা চমকিয়া উঠিলাম। সে সেই কৃষক। তাহাকে সঙ্গে লইয়া নদীতীরে স্থানচ্যুত পাষাণখণ্ডের উপরে বসিলাম। কৃষক 'ছত্রি'র কথা বলিতে লাগিল।

বহুদিনপূর্ব্বে এই 'টীলা' দেখিয়া বাদশাহের বেগমের সাধ হইয়াছিল যে, এইখানে বাস করিবেন। সাধপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, বেগমের কালপূর্ণ হইল। বাদশাহ, তখ্ত

ছাড়িয়া, ফকিরি গ্রহণ করিলেন; প্রাসাদ-নির্ম্মাণের জন্য যে সমস্ত মাল-মসলা আসিয়াছিল, তাহা দিয়া এই 'ছত্রি' নির্ম্মিত হইল—বাদ্‌শাহ নিরুদ্দেশ হইলেন।

মাঝে মাঝে তিনি আসেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে, সেতারের মধুরশব্দে মুগ্ধ হইয়া, পশুপক্ষী 'ছত্রি'র চারিদিকে দাঁড়াইয়া থাকে। প্রভাতে সেতার থামিয়া যায়—মোহ কাটিয়া—পশুপক্ষী চারিদিকে পলাইয়া যায়। ফকির নদীতে স্নান করিয়া, ফুলের মালা গাঁথেন; মালা দিয়া বেগমের সমাধি সাজাইয়া, তিনি কোথায় চলিয়া যান, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আবার সন্ধ্যার সময়ে ফিরিয়া আসেন। তিনি যখন বিদেশে চলিয়া যান, তখন নিশীথ রাত্রিতে কবর হইতে করুণ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হয়; চারিদিকের দশখানি গ্রামের লোক তখন ভগবানের নাম করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাগ্‌দয়ালের পুত্র নওলকিশোর একজন বড় উকিল। তাহার বাপ এখনও চুড়িদার পায়জামা, নিমুর চাপকান, চাঁদটুপি, আর দিল্লীর নাগরজুতা পরিয়া বেড়ায়; কিন্তু সে হ্যাট-কোট-নেকটাই পরিয়া আদালতে যায়। বাপের ভয়ে, সে তাহার টিকিটি কাটে নাই বটে; কিন্তু সেটি সযত্নে চুলের সহিত মিশাইয়া রাখে। প্রাগ্‌দয়ালের অনেক বয়স হইয়াছে। সে পূর্ব্বে নবাব-সরকারে চাকরি করিত। নবাবী-আমল অতীতের কথা হইলে, নওলকিশোর লায়েক হইয়া উঠিল, রোজগার করিতে আরম্ভ করিল; বুড়ার দুঃখ ঘুচিল—সে কেবল পুরাণো জমানার গল্প করিয়াই দিন কাটাইত। লক্ষ্ণৌতে, আমাদের বাংলোর পাশেই মুন্‌সী প্রাগ্‌দয়ালের বাড়ী। আমি তাহার সম্মুখে বাহির হইতাম, এবং সর্ব্বদাই তাহাদের বাড়ী যাইতাম। একদিন সন্ধ্যার পরে বাবুর সহিত মুন্‌সীজির বাড়ীতে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় উণাও-রোডের ধারের সেই 'ছত্রি'র কথা উঠিল। বৃদ্ধ মুন্‌সী সে কথা শুনিয়াই, আমাদের পাইয়া বসিল—কিছুতেই ছাড়িলনা। তখন শীতকাল। কয়দিন ধরিয়া

মেঘ করিয়াছিল ; সন্ধ্যা হইতেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছিল। বৃদ্ধমুনসীজি খানসামাকে নয়া ছিলিম ভরিতে আদেশ করিয়া গল্প আরম্ভ করিল।

মহম্মদআলী সাঁহের আমলে বড়বাঁকীর রূপরাজ একজন প্রসিদ্ধ সেতারী ছিল। সারা হিন্দুস্থান ভরিয়া তাহার সুখ্যাতি ছিল। কত নবাব, বাদশাহ, রাজা, মহারাজা, বড় বড় ভেট দিয়া তাহাকে লইয়া যাইত। হয়দরাবাদ, মইসুর, গোয়ালিয়ড়, ইন্দোর, জয়পুর প্রভৃতি রিয়াসতে তাহার মুশাহরা বন্দোবস্ত ছিল। ইদানীং তাহার বয়স অধিক হইয়াছিল বলিয়া সে আর কোথাও যাইতে চাহিত না। কতলোক আসিয়া ফিরিয়া যাইত, কত ধনদৌলৎ, হীরা, মোতি, টাকা, আশ্রফি ফিরিয়া যাইত। রূপরাজ কোথাও যাইতে চাহিত না। কেবল নওরোজ আর ঈদের সময়ে তাহাকে লক্ষ্ণৌ আসিতে হইত;—সে বাদশাহের হুকুম ঠিক তামিল করিত।

রূপরাজ নিঃসন্তান ছিল। তাহার স্ত্রী অনেকদিন পূর্ব্বে মরিয়াছিল। হরেক-কিসেমের লোক সেতার ও সুরবাহার শিখিবার জন্য রূপরাজের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। রূপরাজ সকলেরই খোরাক যোগাইত এবং কিছু কিছু শিখাইত। সাকৃরিদদের মধ্যে একজন সেতারে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিল; সেই

জন্য বুড়া রূপরাজ তাহাকে বড়ই ভালবাসিত। সে বাঙ্গালা মুলুকের লোক, তাহার হরেকিষণ কি তারাচন্দ, এমনই একটা নাম ছিল! রূপরাজ সে নাম বদ্‌লাইয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল প্রেমরাজ। প্রেমরাজ সর্ব্বদা ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত এবং বড় বড় মজ্‌লিসে, এমন কি জাঁহাপনা শাহান্‌শাহ্‌ বাদশাহের মজলিসে—রূপরাজ যখন ক্লান্ত হইত, তখন প্রেমরাজ বাজাইত। বড় বড় নামজাদা তওয়াইফ্‌ বাই মজুরা করিতে আসিলে, প্রেমরাজ সারেঙ্গীর সুরে সুর মিলাইয়া বাজাইত। এ খাতির রূপরাজের আর কোন সাকরিদ পাইত না।

জানকী অমৌসীর এক নটের বেটী। তাহারা হিন্দু; তাহাদের জাতি নাচিয়া-গায়িয়া বেড়ায়; তাহাতে তাহাদের অপমান নাই। জানকীবিবি—নবাব মহম্মদ আলী ও আমজাদ আলী, দুইজনেরই বড় পেয়ারের তওয়াইফ্‌-ওয়ালী ছিল। তাহার মিঠি আওয়াজে মুগ্ধ হইয়া বাদশাহ আমজাদ্‌ আলী তাহার নাম দিয়াছিলেন—"বুলবুলজান্‌।" যখনকার কথা বলিতেছি, তখন জানকীর যৌবন কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার আওয়াজ মোলায়েম হইয়া যেন আরও মিঠা হইয়াছে। জানকীর ফুটন্ত মল্লিকার মত এক বেটী ছিল। তাহার নাম নারগিস্‌। বাদশাহ আমজাদ্‌ আলী সোহাগ করিয়া

তাহার নাম দিয়াছিলেন নারগিস্। সহরের দুষ্ট লোকেরা বলিত যে নারগিস্ জাঁহাপনা-খোদের বেটী, কিন্তু সে কথা মিথ্যা। জানকী হিন্দুর মেয়ে, সে মজুরা করিত বটে, কিন্তু কস্‌বী ছিল না।

এমনই সময়ে তাহাদের দুজনের দেখা হইয়াছিল। সেবারে শীতকালে বকরীদ্ পড়িয়াছিল। বকরীদে দিলখুসামঞ্জিলে মজ-লিস্ বসিত। সেবার জানকী গায়িল, নাচিল; রূপরাজ সেতার বাজাইল; আর রিফাত খাঁ সঙ্গত করিল। সেখানে নারগিস্ আর প্রেমরাজ দুজনেই উপস্থিত ছিল। প্রেমরাজের বয়স তখন ১৮।১৯; আর নারগিসের বয়স ১৩।১৪। মজলিস শেষ হই-বার ঠিক আগে যত বাই-তওয়াইফ হইত, তাহাদিগের জশম হইত। তোমারা 'জশম' বুঝিলে, না? জশম বড় রঙিলা চিজ্; বাদশাহী জমানার পরে জশম বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সমস্ত বাই-তওয়াইফওয়ালী একসঙ্গে নাচিতে থাকে। সেদিনকার জশমে রূপরাজ আর প্রেমরাজ একসঙ্গে সেতার বাজাইল, রিফাত খাঁ সঙ্গত করিল, আর সেইদিন নারগিস্ নাচিল, গায়িল। মজ্‌লিসের সমস্ত লোক, ইতর ভদ্র, আমীর ওমরাহ, রইস হইতে নকীব হরকরা চোবদার পর্য্যন্ত সকলেই দিল্ খুলিয়া তারিফ্ করিল। অনেকে মোহিত হইল, বাঙ্গালী প্রেমরাজ সেইদিন মরিল।

জানকীবাই অমৌসীর কাছে একটা গাঁওয়ে বাস করিত সাহানশাহ নাসিরউদ্দিন সেখানে তাহাকে সুমেরুতুল্য সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে সে সেখানে প্রসিদ্ধ নামজাদা ওস্তাদ-কলাবৎদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইত। এক হফ্‌তা, হর্‌রোজ মজলিস্ হইত। সে সালে বক্‌রীদের মজলিস্ ভাঙ্গিলে, জানকী সকলকে অমৌসীতে লইয়া গেল। রূপরাজের সঙ্গে প্রেমরাজও গেল।

হরদম নাচ্‌না গাহ্‌না ভিন্ন সেখানে অন্য কাজ ছিল না। সারাদিন মজলিস্ আর বাকী ফুর্স‌তে খানা আর আয়েশ অমৌসীতে বনগঙ্গার ধারে জানকীর মহল। সেই আঁকাবাঁকা বনগঙ্গার তীরে, ড়হর-গহুমের শ্যামলক্ষেত্রের মাঝে ঘাটের মর্ম্মর সোপানে বসিয়া প্রেমরাজ বাজাইত—নারগিস্ নাচিত আর গায়িত। এইভাবে এক হফ্‌তা কাটিয়া গেল। বাই-তওয়াইফ, ওস্তাদ, কলাবৎ নাচ গান লইয়া উন্মত্ত ছিল। কেহই ইহাদের দুজনের দিকে নজর দেয় নাই। জানকী বাইয়ের কুঠীর নিকটে বনগঙ্গার ধারে একটা বড় ভারি 'টীলা' আছে। তাহার উপর গাছপালা জন্মিত না। সেইখানে শ্যামলতৃণক্ষেত্রের উপরে প্রেমরাজ বাজাইত, নারগিস্ গায়িত অথবা নাচিত। তাহারা ভাবিত, কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইত না, কিন্তু একজন দেখিত; সে সয়তান!

সয়তান গিয়া খোজা আফ্রাসিয়াব খাঁকে সংবাদ দিল। সে সংবাদ শাহজাদা ওয়াজিদ্-আলির কাণে পৌঁছিল। শাহ-জাদা জমিন্ ও আস্মানের ভবিষ্যৎ-মালিক, স্বয়ং তওয়াইফ-ওয়ালীর কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া জানকী-বাইয়ের দুয়ারে উপস্থিত হইলেন। জানকী শাহজাদার খাতির করিল বটে, কিন্তু কন্যাদান করিতে পারিল না, বাদশাহজাদা বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিলেন।

একবার একসঙ্গে অনেকের তলব্ আসিল—যিনি বাদশাহের বাদশাহ, মালিকের মালিক, তাঁহার দরবারে বাদশাহ আমজাদ্ আলী, ওস্তাদ রূপরাজ, আরও আউধ-সুবার অনেক রইসের ডাক পড়িল। ওয়াজিদ্ আলী তখ্তনশীন্ হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে খোজা আফ্রসিয়াব খাঁ যাদুমন্ত্রে উড়াইয়া নারগিস্‌কে ছত্রমঞ্জিলে লইয়া গেল। অনেকদিন পরে প্রেমরাজ শুনিতে পাইল যে—নারগিস্ এখন অসূর্য্যম্পশ্যা হজরৎ খয়রা-বাদী বেগম।

দিন কাটিতে লাগিল। কন্যা হারাইয়া জানকী-বাই সহসা অতিবৃদ্ধা হইয়া পড়িল; সে মজুরা-করা ছাড়িয়া দিল। প্রেমরাজও দেওয়ানা ফকিরগোছ হইয়া গেল; তাহাকেও কেহ আর বাদশাহী মজ্‌লিসে দেখিতে পাইত না। দিনকত পরে শুনিতে পাওয়া গেল, বাদশাহ খয়রাবাদী বেগমের উপর

নারাজ হইয়াছেন, কারণ মহল-সরায় আমদানীর পরে তাঁহাকে কেহ হাসিতে দেখে নাই!

সে আর হাসে নাই! যে দিন নারগিসের মুখে আবার হাসি ফুটিল, তাহার ক্ষণেক পরেই খয়রাবাদী বেগমকে মহল-সরার সমস্ত খোজা ও বাঁদী একত্র হইয়া সাদৎবাগে গোর দিয়া গেল। জানকী-বাই তখনও বাঁচিয়া ছিল; সে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া নারগিসের দেহ লইয়া গিয়া আঁকাবাঁকা বন-গঙ্গার ধারে ডুহর-পহুমের ক্ষেত্রের মধ্যে শোয়াইয়া রাখিল, লাখ-লাখ টাকা খরচ করিয়া শাদা মর্ম্মরের 'ছত্রি' বানাইয়া দিল—"

আমি এই সময়ে বলিয়া উঠিলাম, "ছত্রিটা কিন্তু শাদা পাথরের নয়।" প্রাগ্‌দয়াল কিন্তু সহজে পরাজিত হইবার লোক নহে; সে বলিল, "পাথর আগে সবই শাদা ছিল, এখন জলে ঝড়ে কালো হইয়া গিয়াছে।"

"ছত্রি বানাইয়া দিয়া, সমস্ত বিষয়সম্পত্তি দান করিয়া জানকী-বাই কাশীবাসিনী হইল। প্রেমরাজ সেই অবধি নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। দুই বৎসর পরে কোম্পানী-বাহাদুর বাদশাহকে কলিকাতায় ধরিয়া লইয়া গেল; লোকে বলিল, প্রেমরাজ বাঙ্গালী, সেই-ই সলা দিয়া আংরেজ কোম্পানীকে লইয়া আসিল। সত্য-মিথ্যা ভগবান জানেন, তবে

বাঙ্গালীর জন্যই যে সুবে আউধের বাদশাহী গিয়াছে, এ কথা খুব ঠিক, বহুত বহুত ঠিক।"

এখনও মাঝে-মাঝে আঁকাবাঁকা বনগঙ্গার ধারে, ড়হর-গহুমের ক্ষেত্রের মধ্যে শাদা-পাথরের 'ছত্রি'র নীচে বসিয়া প্রেমরাজ প্রিয়তমাকে সেতার বাজাইয়া শুনাইয়া থাকে। সে দেবদুর্লভ বাদ্য শুনিয়া বনের পশু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু তাহা আর মানুষের কাণ অবধি পৌঁছে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্ণৌনগরী ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু সেই 'ছবি'টির কথা ভুলিতে পারি নাই। ওস্তাদজির কোন ছবি তোলা হয় নাই; যদি ছবি থাকিত, তাহা হইলে বুড়া মুন্সী প্রাগ্দয়ালকে দেখাইতাম এবং জিজ্ঞাসা করিতাম সেই-ই প্রেমরাজ কিনা।

অনেকদিন পরে আর একবার ওস্তাদজিকে দেখিয়াছিলাম। তখন আমরা নাগপুর হইতে এলাহাবাদে আসিতেছি। পথে ইচ্ছা হইল যে, একবার নর্ম্মদা দেখিয়া যাইব। জব্বলপুরে আসিয়া নামিয়া পড়িলাম, টঙ্গায় চড়িয়া মিরগঞ্জে চলিলাম। কত গ্রাম, কত গণ্ডগ্রাম পার হইয়া ভেড়াঘাটে যাইতে হয়। জব্বলপুর হইতে ভেড়াঘাট আটক্রোশ পথ। পথে একখানি বড়গোছের গ্রামে টঙ্গা দাঁড়াইল, ঘোড়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। সেইখানে একদল লোক দেখিলাম; তাহারা ভেড়াঘাট হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা আপনাআপনি বলাবলি করিতে করিতে যাইতেছিল—"এমন সেতারী কখনও দেখি নাই, এমন মিষ্টবাদ্যও কখনও শুনি নাই। লোকটা যেন যাদু-

কর! বহুত উমর হইয়াছে, কিন্তু তালিম্ আদমী বটে। হাত বড়ই মিঠা, আমি বহুৎ বহুৎ ভারি ভারি ওস্তাদের বাজনা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন মিঠা ইস্তিমাল্ জন্মে কখনও শুনি নাই!” জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ভেড়াঘাটের মঠে এক ওস্তাদ আসিয়াছেন; তাঁহার মত সেতার বাজাইতে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তি এ অঞ্চলে আর কখনও আসেন নাই!

টঙ্গা ছাড়িল। ভেড়াঘাটে পৌছিলাম। নর্ম্মদার জল-প্রপাত, মর্ম্মরশৈল সমস্ত ছাড়িয়া ওস্তাদের সন্ধানে বাহির হইলাম। মঠের লোকে বলিল যে, ওস্তাদ দূরে গণ্ডগ্রামে বাস করেন; তিনি সন্ধ্যাকালে আসিবেন। আজ চৌষট্টি-যোগিনী-মন্দিরে মজ্‌লিস্ হইবে। দিন কাটিল, চৌষট্টিযোগিনী-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যা হইল; ওস্তাদজি আসিলেন; বাজনা আরম্ভ হইল। আমরা চিনিলাম, কিন্তু তিনি চিনিতে পারিলেন না।

দ্বিপ্রহর রাত্রিতে মজ্‌লিস্ ভাঙ্গিল। তখন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “ওস্তাদজি! বড়াবাঁকীর রূপরাজমিশ্রকে চিনিতেন কি?”

প্রশ্ন শুনিয়া বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে সামলাইয়া ওস্তাদজি জিজ্ঞাসা করিলেন—“বাবুসাহেব, তুমি কে?” উনি পরিচয় দিলেন;—

কাশীর পাণ্ডা দুর্গাপ্রসাদের কথা, আমার সেতারশিক্ষার কথা, ছত্রির ছবি দেখার কথা—সকল কথাই বলিলেন। ধীরে ধীরে বৃদ্ধের স্মৃতি ফিরিয়া আসিল; এইবার তিনি চিনিতে পারিলেন। আমরা দুজনে তখন তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য ধরিয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলেন না; তবে অনেক অনুরোধ উপরোধের পরে বলিলেন—"প্রভাতে বলিব।" ওস্তাদজি সে রাত্রি চৌষট্টি-যোগিনী-মঠেই কাটাইবেন—আমরা থাকিব রেষ্ট্ হাউসে। প্রভাতে উঠিয়া শুনিলাম, ওস্তাদজি নাই—বৃদ্ধ রাত্রিতেই নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।

এই ঘটনার একমাস পরে এলাহাবাদে একজন সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। আমি তখন টুনিকে চিঠি লিখিতেছিলাম—সে তখন বিলাতে। সন্ন্যাসী নব্যতন্ত্রের; মাথায় জটা নাই, লম্বা কালো চুল, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, কৌপীন ও চিমটার বদলে গৈরিক-আলখাল্লা, আর একটি ছোট চামড়ার ব্যাগ।

সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন, "আপনার ওস্তাদ স্বর্গীয় লালা প্রেমরাজ একটি পুরাণো সেতার ও একখানি পত্র আপনাকে দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সেই পত্র।" ওস্তাদজি নাই! সন্ন্যাসীকে বসিতে বলিয়া চিঠিখানি খুলিলাম। চিঠিখানি বাংলায় লেখা:—

"মা,

তুমি আমার শিষ্যা—একমাত্র শিষ্যা। বিবাহ করি নাই, সন্তানহীন, সুতরাং তুমিই আমার সন্তান। আমার একটি অনুরোধ আছে; গুরুর শেষ অনুরোধ মনে করিয়া তাহা পালন করিও। এই সন্ন্যাসী আমার নিকট সেতার শিখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু কালপূর্ণ হওয়ায় তাহা আর হইল না। সন্ন্যাসী আমার পুরাণো সেতারটি দিবেন; সেটি তাহার গোরের উপরে রাখিয়া দিবে।

মুন্সী প্রাগ্দয়াল আমার বন্ধু। শুনিয়াছি তাহার নিকট তোমরা সমস্ত কথাই শুনিয়াছ। সেই সমাধিটি জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, ছবিতে ইহা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলাম। সেইজন্যই কাশীত্যাগ করিয়াছিলাম। সমাধি দেখিয়া চোখে জল আসিয়াছিল। 'ছত্রি'টি বনগঙ্গার বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; তাহার উপরে বড় বড় গাছ জন্মিয়াছে; পাথরগুলা সরিয়া গিয়াছে। শীঘ্রই ছত্রিটি ভাঙ্গিয়া তাহার বুকের উপর পড়িবে! তাহার পর যাহা করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা ত দেখিয়াই আসিয়াছ।

মনে করিয়াছিলাম ভিক্ষা করিয়া তাহার সমাধি সংস্কার করিব; কিন্তু সময়ে কুলাইল কই? মা, তোমাকে মন খুলিয়া

আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি, আমার পুরাণো সেতারটি তাহার কবরের বুকের উপরে রাখিয়া আসিও।

আশীর্ব্বাদক—

প্রেমরাজ শর্ম্মা।

সেতার দিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। বাবু আসিলে পত্র দিলাম ও সেতার দেখাইলাম। দুইদিন পরে সেতার লইয়া তিনি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন।

তিনচারি দিন পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর, চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু।

তিনি, প্রাগ্‌দয়াল ও নওলকিশোর সেই 'ছত্রিতে' সেতার রাখিতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহারা ফুলের মালা ও দীপে ছত্রি ও কবর সাজাইয়া সেতারটি কবরের বুকের উপরে শোয়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। রাত্রে ঝড়বৃষ্টির জন্য ফিরিতে পারেন নাই। সেই রাত্রিতে বনগঙ্গা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া—'ছত্রি', কবর ও সেতার—সবগুলিকে অনন্তে মিশাইয়া দিয়াছে!—সেখানে আর কিছুই নাই!

অধিকারে বঞ্চিতা

১

(ক)

প্রিয়তম, ১৬ই বৈশাখ।

তুমি আমার দেবতা। শুনিয়াছি দেবতারা অন্তর্যামী। ভক্তের অস্ফুট অব্যক্ত প্রার্থনা তাঁহাদিগের সিংহাসনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিচলিত করিয়া তোলে। তুমি যদি আমার দেবতা হও, তাহা হইলে আমার এই প্রার্থনাও তুমি শুনিতে পাইবে। আমি লিখিয়া রাখি মাত্র, লজ্জায় তাহা তোমার কাছে পাঠাইতে পারি না। কিন্তু তুমি ত অন্তর্যামী, সুতরাং পাঠান না হইলেও ইহা তোমার কর্ণগোচর হইবে।

আমি কাল সকালে আসিয়াছি, আজ সন্ধ্যা হইয়া গেল, তুমি ত এখনও আসিলে না। আগে ত তুমি এমন ছিলে না? কেন আসলে না? কি জন্য আসিলে না? কবে আসিবে? আমি আসিয়াছি বলিয়া কি আসিতেছ না? পূর্ব্বে ত এত ঘৃণা করিতে না? আমি কি তখন এত কালো ছিলাম না, আমার

মসীকৃষ্ণ বর্ণ কি তবে এবারে গাঢ়তর হইয়াছে? তুমি সুন্দর, তুমি কালো দেখিতে পার না, কিন্তু তথাপি আমাকে একেবারে পায়ে ঠেল নাই। তোমার রূপ ভুবনমোহন, তোমার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, তুমি কেননা কালোকে ঘৃণা করিবে? কিন্তু যেদিন এই মসীবর্ণ নববধূ লাল চেলী মণ্ডিত হইয়া, তোমার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে দিন ত ইহাকে পায়ে ঠেল নাই, তাহার পরদিন ত ইহাকে পায়ে ঠেল নাই!

আগে ত আসিতে! তখন আমি দূর হইতে তোমাকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতাম। কখনও চরণস্পর্শের অধিকার দাও নাই, সেই জন্যই সে সুখ জীবনে আস্বাদন করি নাই। মানুষের পক্ষে বৈকুণ্ঠ যেমন দুর্লভ, তাহা আমার পক্ষেও তেমনই দুর্লভ জানিয়া কখনও ত তাহা কামনাও করি নাই। দূরে থাকিয়া তোমায় দেখিয়াছি, ইহাই তোমার কাছে অপরাধ? আমার কালো দেহের কালো চোখের কাতর চাহনি, তোমার শুভ্র, সুন্দর চরণপ্রান্তে পড়িয়া কি তাহা মলিন করিয়া দেয়?

ইহাই যদি আমার অপরাধ হয়, তবে আর চাহিব না, আর কখনও কালোর কালো চোখের চাহনি তোমার জ্যোৎস্না-বরণ কলঙ্কিত করিবে না। সত্য বলিতেছি, আর চাহিব না। তুমি যখন আসিবে, তখন আমার মলিন চাহনি নয়নপল্লবের কারাগারে বাঁধিয়া রাখিব। তবে যখন তোমাকে দেখিবার

জন্য আমার কালো হৃদয়ের ভিতরটা আকুল হইয়া উঠিবে, তখন নয়ন মুদিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দেখিব, তখন আমার কারা-বদ্ধ নয়নতারার সম্মুখে তোমার মূর্ত্তি স্থির হইয়া থাকিবে। তাহাতেও কি অপরাধ হইবে?

তুমি আসিও, আগে যেমন আসিতে, তেমনই আসিও, আমি তোমার পানে চাহিবও না। তুমি আসিও, তোমার ঘরে তুমি বসিও, আমি আগেকার মত মল্লিকা ও চামেলীর তোড়া বাঁধিয়া, মেজে ফুলদানিতে রাখিয়া দিব। তোমার জন্য বিছানায় আগেকার মত রাশি রাশি বেল আর গোলাপ ছড়াইয়া রাখিব। তুমি যখন আসিবে, তখন আমি দূরে তোমার নয়ন পথের বাহিরে থাকিব। পরদিন প্রভাতে আসিয়া দলিত কুসুমের ক্ষীণ গন্ধের সহিত তোমার দেহের গন্ধের আঘ্রাণ পাইব।

চন্দনা মরিয়া গিয়াছে, বিড়ালটাকেও আর দেখিতে পাই না, বেঁজিটা একবারও আসে না। তুমি তাহা দেখ নাই? তোমার জন্য তাহাদিগকে লালনপালন করিতাম, তোমার বলিয়া তাহাদিগের জন্য পরিশ্রম করিতাম, আমি চলিয়া গেলে তুমি কি তাহাদের খোঁজ লও নাই? পাখীটার দাঁড়টা পড়িয়া আছে, বিড়ালের শুইবার বাক্সটাকে কে ফেলিয়া দিয়াছে, বারান্দায় বেঁজির শিকলটা ভিজিয়া ভিজিয়া মরিচা ধরিয়া গিয়াছে, তুমি কতদিন আস নাই!

তুমি আসিও, আমি ঘর দুয়ার সাজাইয়া বসিয়া আছি, তুমি আসিও। বিড়ালটাকে আর বেঁজিটাকে ধরিয়া আনিব, তুমি আর একটা পাখী কিনিয়া আনিও। আমি আর কখনও যাইব না, আমি গিয়াছিলাম বলিয়াই কি তুমি রাগ করিয়াছ? তুমি আসিও, আমি আর কখনও যাইব না, তুমি আসিও।

তোমার
সেবিকা।

(খ)

প্রিয়তম,

তুমি আস নাই, আমি সমস্ত রাত্রি বসিয়াছিলাম। পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে অন্ধকারে বসিয়াছিলাম, তোমার ঘরে বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, কিন্তু তুমি যদি হঠাৎ আসিয়া পড়, যদি হঠাৎ আমাকে দেখিয়া ফেল, সেই জন্য পাশের ঘরে অন্ধকারে লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ত আসিলে না!

বাড়ীর আলো নিবিয়া গেল, কিন্তু তোমার ঘরের আলো কেহ নিবাইতে আসিল না। আমার মনে ভরসা হইল, তবে বুঝি তুমি আসিবে, আমি অন্ধকারে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। তুমি যে যে ফুল ভালবাসিতে, সেই সেই ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া, তোড়া বাঁধিয়া ঘরময় সাজাইয়া রাখিলাম, এখন তাহা শুকাইয়া গিয়াছে, তুমি ত আসিলে না!

অধিকারে বঞ্চিতা

তুমি কতদিন আস নাই জানি না, কেহ আমার কোন কথার উত্তর দেয় না, জিজ্ঞাসা করিলে হাসে, আর আমার লজ্জা করে। তোমার ঘর আমার দেবমন্দির; তাহা ধূলিময় আবর্জ্জনাময় দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল; মর্ম্মরের গৃহতল ধূলিধূসর হইয়া গিয়াছে; ঘরময় মাকড়সার জাল, শয্যা ইন্দুরে কাটিয়া শতখণ্ড করিয়াছে, ছবিগুলা ছিঁড়িয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দরজাগুলা খোলা, সার্সিগুলা প্রায় সবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বৃষ্টির জল আসিয়া সাদা পাথরের উপর কাদা মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা আবার শুকাইয়া গিয়াছে। দাস-দাসী আছে, কিন্তু থাকিয়াও নাই, আমার কথা তারা কেন শুনিবে, আমি কে? আমি যে কালো বলিয়া দাসীরও অধম! একা তোমার মন্দির মার্জ্জনা করিয়াছিলাম, দেবতার বেদী সজ্জিত করিলাম, পূজার আয়োজন করিলাম, কিন্তু দেবতা, তুমি আসিলে কই?

তুমি যাহা খাইতে ভালবাসিতে, তাহা নিজে হাতে রাঁধিয়া আনিয়াছিলাম; তুমি যেখানে বসিয়া খাইতে ভালবাসিতে, সেইখানে তোমার ভোগ সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা এখনও সেইভাবে আছে। সেইভাবেই থাকিবে, যতদিন তুমি না আসিবে, ততদিন তাহা তেমনই থাকিবে। আমার কাজ দেখিয়া, তোমার গৃহসজ্জা, ভোগসজ্জা দেখিয়া সকলেই

মৃদুমৃদু হাসিয়াছিল, তখন বুঝিতে পারি নাই যে তাহা বিদ্রূপের হাসি!

আলো নিবিয়া গেল, একা আমি ব্যতীত আর কেহ তোমার গৃহে জাগিয়া রহিল না, পাড়া ঘুমাইল, নগর ঘুমাইল, দেশ ঘুমাইল। উদ্যানে বটগাছে যে ঘুঘুটা ডাকিয়া উঠিত, আর তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, সেটা ডাকিয়া উঠিল! অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, পথ দিয়া কে একজন জুতা পায়ে দিয়া আসিল, আমি ভাবিলাম, এতক্ষণে বুঝি তুমি সত্যসত্যই আসিলে। না, সে চলিয়া গেল। সে নয়। একটা মাতাল পথ দিয়া গান গায়িতে গায়িতে চলিয়া গেল। —

তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখ পানে চেয়ে হাসিয়ো!

বেশ গানটি! আমাদের প্রতিবেশী যুবকেরা পথ দিয়া কোলাহল করিতে করিতে গৃহে ফিরিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে, তখনও আমার তন্দ্রা আসে নাই, কেবল তোমার জন্য ভয় হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, হয়ত তোমার কোনও বিপদ্ হইয়াছে, সেইজন্য তুমি আসিতে পারিলে না। রাত্রি তিন প্রহর, কে আসে? কে যেন পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতেছে; তবে কি তুমি আসিতেছ?

একজন পুরাণো লোক আসিতেছে; মেনি বিড়ালটা

কোথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে মাথা ঘসিতেছে। সেকি নিত্যই স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া নিত্যই ফিরিয়া আসে? তুমি যতদিন আস নাই, ততদিন সেকি নিত্যই তোমার সন্ধানে আসে এবং নিত্যই ফিরিয়া যায়? সে আজ আমাকে কত আদর করিল, আমাকে পাইয়া সে যেন বড়ই আনন্দিত হইয়াছে,তাহাই জানাইল। তাহার পর একবার ঘরময় তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইল। তুমিত আসিলে না, সে সমস্ত রাত্রি আমার সহিত জাগিয়া বসিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

আর একজন আসিয়াছিল, সেও তোমারই সন্ধানে। সেও বোধ হয় নিত্য আসে, তোমার সন্ধান না পাইয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়। সেটা সেই বেঁজি, কতদিন তাহাকে দেখি নাই। সেও আমাকে চিনিল, আগেকার মত তাহার ভিজা নাকটা আমার বুকের মধ্যে লুকাইল। খাইতে চাহিল, তাহাকে আর মেনিকে আমার খাবারগুলা ধরিয়া দিলাম।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, স্নিগ্ধ-শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। হঠাৎ হু হু করিয়া একটা হাওয়া দিল, সাসিগুলা ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, খড়খড়িগুলা খট্ খট্ করিয়া নড়িয়া উঠিল, তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া-গেল। মনে হইল, কে যেন খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভাবিলাম, হয়ত তুমি আসিয়াছ, হয়ত তোমার দয়া হইয়াছে, তুমি সত্যসত্যই গৃহে ফিরিয়াছ এবং আমাকে অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতে দেখিয়া দুয়ারের আড়ালে দাঁড়াইয়া হাসিতেছ!

না, ভুল, খেয়াল, মনের একটা খেয়াল। না হয় চিত্ত-বিকার! তুমিত আস নাই, তুমিত হাস নাই, তোমার শয্যা যেমন রাখিয়া দিয়াছিলাম তেমনই আছে। তবে কে হাসিল? মনে হইল, কে যেন আমার অবস্থা দেখিয়া প্রত্যূষের আলো আঁধারে লুকাইয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে। বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল, সমস্ত আলোগুলা জ্বালিয়া দিয়া সকল ঘরগুলা দেখিয়া আসিলাম, কেহইত আসে নাই। একটু একটু করিয়া আলো ফুটিতেছে, মেনি চলিয়া গেল, বেঁজিটা আগেই গিয়াছে। তাহারা এতক্ষণ ছিল বলিয়া মনে হইতেছিল যেন আমি একা নাই। তুমি আস নাই, ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইলাম, আলোটা তখনও জ্বলিতেছে, ফুলগুলা শুকাইয়া গিয়াছে। বড় আর্শিখানা আমাকে দেখিয়া অবজ্ঞায় হাসিয়া উঠিল, ছবির ফ্রেমের কাঁচগুলাও যেন হাসিয়া উঠিল। আমি লজ্জায়, ঘৃণায়, মরমে মরিয়া গেলাম।

দেবতা, তুমি আমার দেবতা, আমার হৃদয়ের বেদনা তুমি ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারিবে? তুমি একবার আসিও। আমি এখানে থাকিলে তুমি যদি বিরক্ত হও, তোমার গৃহ যদি

তোমার অসহ্য বোধ হয়, তাহা হইলে আমি থাকিতে চাহি না। কোথায় যাইব বলিয়া দিও, আমি সেইখানে যাইব। তবে তুমি একবার আসিও, আমাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে একবার আসিও। বিশ্বজগৎ আমাকে দেখিয়া অবজ্ঞাভরে হাসিয়া উঠিতেছে, তাহা ভাবিয়া আমার প্রাণমন লজ্জা-ঘৃণায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তুমি আমার নারায়ণ, লজ্জা-নিবারণ, তুমি আসিয়া সে লজ্জা নিবারণ করিয়া যাইও।

আসিও, একবার আসিও, লোকে অনুরোধে, উপরোধে, দয়া করিয়া কত কাজ করে। তুমি দয়া করিয়া একবার আসিও, আমাকে বিদায় দিবার আগে একবার আসিও।

তোমারই
পদাশ্রিতা।

(গ)

১০ই বৈশাখ,
মঙ্গলবার।

দিদিমণি,

আমরা সকলে নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, পথে কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। আমাদের বাড়ীটি বেশ নির্জ্জন জায়গায়, সম্মুখে একটা ছোট রাস্তা আর তাহার আড়পারে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী, পিছন দিকে একটা বড় মাঠ, তাহাতে কেবল কচুগাছ। কাছে আর কোন বাড়ী-ঘর নাই। এ পাড়াটা

বড় নির্জ্জন, কলকাতা সহরের মত মোটেই নয়, এ যেন একটা পাড়াগাঁ। এত বড় কল্‌কাতা সহর, তার মধ্যে বাড়ী পাওয়া গেলনা, এই এক লক্ষ্মীছাড়া জায়গায় এসে বাড়ী করেছেন। ভেবেছিলাম উনি কল্‌কাতায় বদলী হচ্ছেন, সহরে যাব, কত গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম, মোটর্‌কার দেখ্‌তে পাব, তা' আমার যেমন বরাত, এমন অখদ্দে জায়গায় বাড়ী নিয়েছেন যে, দেশের মত কেবল ছেকড়া গাড়ী আর গরুর গাড়ী। প্রথম-প্রথম দুই-এক দিন এই কথা বলাতে হেসে ওঠেন, আর আমি অপ্রস্তুতে পড়ি।

এতবড় দিনটা আর কাটেনা। আমার সংসারের যা কাজ তা' দু-তিন ঘণ্টাতেই হয়ে যায়; উনিত আপিস চলে যান্‌, বামুন্‌টা মুখে আট-দশটা পান গুঁজে বেড়াতে বেরোয়, বুড়ো ঝি আর হিন্দুস্থানী চাকরটা সারাদিন ঘুমোয়। আমি কি করি বল দেখি? কোন উপায় না পেয়ে হাঁ করে সারাটি দিন ঐ বড় বাড়ীটার পানে চেয়ে বসে থাকি। আজ আর সেদিকপানে চাইতে পারছি না, প্রাণটা যেন হাঁফিয়ে উঠ্‌ছে, তাই তোমাকে একখানা লম্বা-চৌড়া পত্র ফেঁদে বসেছি।

বাড়ীখানা প্রকাণ্ড, দু-মহল। সম্মুখে আর পিছনে মস্ত পুকুর আর বাগান, কিন্তু কেমন যেন শ্রী ছাঁদ নাই। বাড়ীতে লোক আছে, তারা ফটক দিয়ে যাওয়া-আসা করে, কিন্তু ঠিক যেন চোরের মত। বাড়ীর মালিকদের কাউকে দেখ্‌তে

পাওয়া যায় না। অন্দরমহলে একটা অংশ ঠিক আমাদের বাড়ীর সম্মুখে, কিন্তু সে অংশটায় এখন কেউ থাকে না। তার সমস্ত দরজা-জানালাগুলো দিনরাত্রি খোলা থাকে। সম্মুখে দু'তিনটি ঘর; একটা শোবার, একটা বসবার, আর একটা পড়বার। শোবার ঘরটি মার্ব্বেল পাথর দিয়ে মোড়া, এক-পাশে একখানি প্রকাণ্ড মেহগিনির খাট, আর এক-কোণে একটা মেজ। ঘরের দেওয়ালে পাঁচ সাতখান দামী-দামী ছবি ছিল, সে গুলো সব দড়ি ছিঁড়ে পড়ে ভেঙ্গে গেছে। একখানা বড় দাঁড়ানো আরসী আছে, রাত্রিতে চাম্‌চিকাগুলো তার উপরে বসে থাকে; ঘরে বিদ্যুতের আলো, পাখা, কিন্তু এসে অবধি একদিনও আলোজ্বালা দেখ্‌তে পাই নি। সমস্ত দিন-রাত্রি ধরে ইঁদুরের রাজ্য, খাটের বিছানা-পত্রগুলা ত কেটে-কুটে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছে। এইত গেল এক ঘর, এর পাশে বসবার ঘর, তাতে অনেক টাকার দামী-দামী আসবাব ছিল, পাখীতে আর ইঁদুরে নিত্য-নিত্য তার সর্ব্বনাশ করেছে। ঘরের দেওয়ালে সাত-আটখানা খুব বড় বড় ফটো-গ্রাফ আছে তার কাঁচগুলো সব ভেঙ্গে গেছে, ঝড়ে বিদ্যুতের আলোর ঝাড়টি ভেঙ্গে পড়ে গেছে, পাখীর পালক, ধূলো, কাদা আর ময়লায় দামী-দামী মখ্‌মল মোড়া কেদারাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বড়লোকের ত আর জিনিষে দরদ্‌ নেই, আমাদের

ভাঙ্গা কাঠের চৌকীগুলো নিয়ে আমি তিনবেলা ধূলো ঝেড়ে মরি। গদীগুলা, কেদারাগুলা একেবারে গেছে, চামড়ার গুলো এখনও মেরামত চলতে পারে। এই ঘরের মাঝখানে একখানি সুন্দর মেজ, তার উপরে একটি ছোট সোণার (কি সোণালি রং করা) ঘড়ি, মস্ত মস্ত বেলোয়ারীর দোয়াত আর কলমদান, জরির কাজ-করা একখানা বেলাটিনের খাতা, পাথরের ছোট-বড় অনেকগুলো কাগজ-চাপা। ঘরটি দেখলে মনে হয়, কে যেন একদিন ঘর থেকে চলে গেছে, তা'র পরে যেন আর এদিকে আসেনি।

বস্‌বার ঘরের পাশেই পড়্‌বার ঘর। সমস্ত ঘরটিতে কেবল বইয়ের আলমারি। এত বই কখনো একসঙ্গে দেখিনি। হায় হায় দিদিমণি, আমার যদি এতগুলা বাঙ্গলা বই থাকত, আর সবগুলা যদি টিকৃটিকির নভেল হ'ত, তাহলে কি আর দিন কাটাবার ভাবনা থাকে? না, তোমাকে চারপাতা চিঠি লিখ্‌তে গিয়ে ঘেমে মরি! তোমার দাদা একধরনের মানুষ। যদি কোন দিন বাঙ্গলা বই আন্‌তে বলি, তাহলে বলেন, কাশীদাসের মহাভারত পড়বে?" আমি গড় করি আর বলি, "বেশ আছি ঠাকুর, আর দয়ায় কাজ নেই।"

ঘরের মাঝখানে একটা বড় কালো মার্ব্বেল পাথরের মেজ আছে, তা'র উপর একখানা বই খোলা পড়ে আছে, আর তার

কাছেই একখানা গদী-আঁটা কেদারা আছে। ঠিক যেন এক-জন্ পড়্তে পড়্তে উঠে চলে গেছে, আর ফেরেনি। রোজ সন্ধ্যাবেলায় একটা কালো বিড়াল ঘরময় কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, বোধ হয় সমস্ত রাত্রি থাকে, ভোরের বেলায় চলে যায়। এক-একদিন একটি ছোট বেঁজি এসে ঘরগুলাতে ঘুরে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে কেমন একরকমভাবে ডাকে, শুন্‌লে বড় দুঃখ হয়!

বাড়ীটা যেন একখানা উপন্যাস। আহা কোন্ হতভাগীর সোণার সংসার, কে এমন করে ছারেখারে দিয়েছে। আমরা ভাল আছি, তুমি আর ঠাকুরজামাই কেমন আছ লিখো। খুব শীঘ্র পত্রের জবাব দিও, তা' নইলে তোমার ভাজটি একেবারে ক্ষেপে যাবে।

স্নেহের
ছোট-বৌ।

ঘ

দিদিমণি, ২৬শে বৈশাখ।

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি আমাকে ভুলেই গেলে। আজ কয়দিন থেকে আমার বাসার সম্মুখের ঘর কয়টায় লোক এসেছে। একদিন দেখি শোবার ঘরে একটা ছায়া, দেখেই ত আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। তার পর ভাল করে দেখি যে ছায়া নয়, একটি বউ, দিব্বি ছোট

খাট বেঁটে বউটি। তুমি ভাই রাগ ক'র না। আমি সাত হাত লম্বা ধেড়ে বউ দুচোখেই দেখতে পারি না।

বউটী এসে ঘর দুয়ার দেখে যেন অবাক হয়ে গেল, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, তারপর বারান্দার দিকে এল। বাবারে কি কালো, এমন কালো ত জন্মেও দেখিনি ভাই! হয় হাড়ী, না হয় তেঁতুলে বাগ্দীর মেয়ে। আমরা অবশ্য ডানা-কাটা পরী নই, কিন্তু ভাই তা'বলে অমন বিদ্‌ঘুটে কালোও নই। বারান্দায় এসে বৌটির মুখ খুলল, কালো বটে কিন্তু মুখখানি বেশ। তার চোখ-ভরা জল, স্রোতের জলের মত গালদুটি বয়ে পড়্ছিল। দেখে বড় কষ্ট হল ভাই!

সমস্ত দিন বউটি সেই ঘর, দুয়ার সমস্ত মুক্ত করিয়া ফেলিল, বিছানা-মাদুর সারিয়া-সুরিয়া গোছাইয়া রাখিল। তারপর বাগান হইতে রাশি রাশি বেল যুঁই আর চামেলি তুলিয়া আনিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল। ঘরময়, বিছানাময় ফুল ছড়াইয়া রাখিল, আমি অবাক হইয়া বসিয়া তাহার কাণ্ড-কারখানা দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সংসারের কাজে চলিয়া গেলাম, রাত্রি দশটার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, অন্ধকার ঘরগুলা বিদ্যুতের আলোকে দিনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, ঘর-দুয়ার বাসরসজ্জায় সাজাইয়া সেই কালো বৌটা কোথায় বসিয়া আছে।

সমস্ত রাত্রি আলো জলিয়াছে, একবারও নিবে নাই, বৌটা বোধ হয় সারা রাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিল, কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল, তাহাত বুঝিলাম না। সকাল বেলায় তোমার দাদাকে সকল খুলিয়া বলিলাম। তিনি কেমনধারা মানুষ তা' জান ত? তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন আর আমি বেকুব বনিয়া বসিয়া রহিলাম।

আজ আর কোন কাজ ভাল লাগিতেছে না। বৌটার জন্য মন বড়ই খারাপ হইয়া আছে। বৌটি বড় শান্ত, বড় সুলক্ষণা, তাহার জলভরা চোখদুটি দেখিলে বড় দুঃখ হয়, কি জানি কেন মনটা তার জন্য থাকিয়া থাকিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। বেলা হইয়া গিয়াছে, তোমার দাদা আপিসে গেছেন, আমি খাওয়া-দাওয়া করিয়া উপরে উঠিয়াছি, কিন্তু এখনও ঘর-দুয়ার সাফ হয় নি। সাদা পাথরের উপরে ফুলের রাশি শুকাইয়া পড়িয়া আছে, খাটের উপরে রাশি রাশি ফুল আর মালা পড়িয়া আছে, শোবার ঘরের এককোণে রূপার বাসন ঢাকা খাবার পড়িয়া আছে, কিন্তু ঠাকুরঝি, সে বৌটিকে আর দেখিতে পাইলাম না।

বারান্দায় বসিয়া তোমার চিঠি লিখিতেছি, আর ঠায় বড় বাড়ীর দিকে চাহিয়া আছি। খানিক পরে দেখি, পড়িবার ঘরে বৌটি মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কি লিখিতেছে;

তাহার গায়ের কাপড় ভিজা, মাথার চুল ভিজা, চুলগুলা সাদা পাথরের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বৌটি একখানি চিঠি লিখিতেছে; অনেকক্ষণ ধরিয়া চিঠিখানা লিখিল, তাহার পর খামে বন্ধ করিয়া রাখিল। তা'র পর সেইখানেই আবার শুইল। সেই টেবিলটার উপর খোলা বই পড়িয়াছিল, সেই টেবিলটার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। সন্ধ্যা অবধি সেই ভাবে পড়িয়া রহিল। আজ বড় গরম, হু হু করিয়া আগুনের মত হাওয়া দিতেছে, সেই হাওয়ায় তাহার ভিজা কাপড় শুকাইয়া গেল, মাথার চুল শুকাইয়া উড়িতে লাগিল, কিন্তু বৌটি সেই এক-ভাবে পড়িয়া রহিল। বাড়ীর লোকই বা কেমনতর, একটা ঝি কি চাকর একবারও বৌটাকে ডাকিল না।

ঠাকুর ঝি, এই পাড়ায় আসিয়া আমায় যেন কিসে পাই-য়াছে, আমি সারাটি দিন ঘর সংসার ফেলে এই বারান্দাটীতে পা ছড়িয়ে ব'সে থাকি, আর বড় বাড়ীটা আর সেই কাল বৌটিকে দেখি। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, উনি আসিয়াছেন, কাজে যাই। আজ আর ঘরে আলো জ্বালে নাই, বৌটি এখনও সেইভাবে পড়িয়া আছে।

তোমার ভালবাসার
ছোট-বৌ।

৬

দেবতা,

তুমি কোথায় আছ, তাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তুমি কেন আস না তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু সব দেখিয়া, সব জানিয়া মনে কেমন ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে, সে সন্দেহ যে কিছুতেই মিটিতেছে না। তুমি আসিলে না, আবার সারা রাত্রি তোমার প্রতীক্ষায় জাগিয়া রহিলাম, তবুও তুমি আসিলে না। এবার আর বাসর সাজাইয়া বসি নাই, সকালবেলায় স্নান করিয়া আসিয়া যে চোরখানায় তুমি বসিতে, তাহারই পায়ের তলে মাথা রাখিয়া শুইলাম, সারাটি দিন কাটিয়া গেল। সারাদিন সারারাত্রি অতি দীন ভক্তের মত তোমার মন্দির তলে একাগ্র-চিত্তে তোমারই ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়িয়া রহিলাম, তোমার সিংহাসন ত টলিল না! তোমার দেখা ত পাইলাম না! কালও তাহারা আসিয়াছিল, কালও মেনি বিড়াল ও রূপি-বেঁজি তোমার জন্য বসিয়াছিল, তাহারা সমস্ত রাত্রি আমার সেবা করিয়াছিল। আবার রাত্রি প্রভাত হইল।

দেবতা, প্রিয়তম! তোমাকে দেখিয়াছি, নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছি, দেখিয়া যেন কেমনতর হইয়া গিয়াছি। তুমি ত আসিলে না, বুঝিলাম তুমি আসিবে না। তখন একবার তোমাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলাম। কতদিন

দেখি নাই—সে কতদিন! সেই তুমি "ক্ষুধিত পাষাণ" পড়িতেছিলে, আমি তোমার জন্য পান লইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম) পাছে আমার পদশব্দে তোমার পড়ার ব্যাঘাত হয়, সেই ভয়ে তোমার নিকট আসিতে পারিতেছিলাম না। আর কি জান? লজ্জা করে, আমার এই কুৎসিত কদাকার কালো মূর্ত্তিটী তোমার ভুবনমোহন রূপের সম্মুখে আনিতে লজ্জা করে। তুমি বড় সুন্দর; তুমি কত সুন্দর তাহা কি জান? দর্পণে সে সৌন্দর্য্য প্রকৃতরূপে প্রতিফলিত হয় না, সে হয় কেবল আমার চোখে। আমার এই কাল মুখের সাদা চোখের কালো তারাছুটিতে তুমি কত সুন্দর তাহা কি জান? তুমি বিরক্ত হইলে আমার বড় অভিমান হয়। বড় সাধ করিয়া গিয়াছিলাম, আমার এ কালোরূপ চিকণ করিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সাধ মিটিল কই? ভাবিয়াছিলাম তুমি হয়ত ডাকিবে। চিরদিন দীর্ঘ বরষ-মাস আমার কি একই ভাবে কাটিবে?

তুমি আমার, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তুমি আমার, তবু তুমি আমার নহ। ভাবিয়াছিলাম হয় ত আজ ডাকিবে, আজ তোমার নিকটে যাইব, আজ তোমাকে স্পর্শ করিব. আজ তোমার চরণতলে লুটাইয়া পড়িব, সঞ্চিত হৃদয়-বেদনা ঢালিয়া দিব। বলিব তুমি আমার, তোমাতে আর কাহারও অধিকার নাই; বলিব তোমায় ভালবাসি, তোমায়

বড় ভালবাসি; বলিব যে আর কখনও তোমায় ছাড়িব না, আমার কালো হৃদয়ের পিঞ্জরে তোমার আলো-করা রূপ ধরিয়া রাখিব।

তুমি ডাকিলে না, যাওয়া হইল না, বলা হইল না, স্পর্শ করা হইল না, সব সাধ অপূর্ণ রহিয়া গেল। বড় অভিমান হইল, হৃদয় শূন্য হইয়া গেল, কে যেন আমায় ঠেলিয়া দিল. আমি চলিয়া গেলাম। আমার পদশব্দে তুমি চাহিয়া দেখিলে, কি ভাবিলে জানি না, কিন্তু মেজের উপরে "গল্পগুচ্ছ" এখনও পড়িয়া আছে, তাহার পর কি আর আস নাই?

দারুণ অভিমানভরে চলিয়া গিয়াছিলাম, মনে করিয়া-ছিলাম, তুমি না ডাকিলে আর আসিব না। কাহার জন্য আসিব? কিসের জন্য আসিব? কেন আসিব? তুমি আমার, সংসার আমার, ঘর-দুয়ার ধন-দৌলত সব আমার অথচ কিছুই আমার নয়, কেহই আমার নাই। ইহা অসহ্য!

চলিয়া গেলাম, কিন্তু থাকিতে পারিলাম কই? তোমার মূর্ত্তি আমাকে টানিয়া আনিল, কিন্তু আসিয়া ত আর দেখিতে পাইলাম না। তোমার জন্য আসিলাম, কিন্তু তুমি কোথায়? আজ কয়দিন তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, কিন্তু তুমি ত আসিলে না! তোমাকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তুমি কোথায় আছ, কি ভাবে আছ, আর কেন

আস না, ইহাই জানিবার জন্য বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিতে লাগিল। আর স্থির থাকিতে পারিলাম না।

এ বাড়ীতে ত আমি কেহ নই, সুতরাং আমার কথা শুনিবে কে? কে আমার প্রার্থনা পূরণ করিবে? অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিব বলিয়া একজন দাসীকে বশীভূতা করিলাম। আমার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ আমার অলঙ্কার-গুলি তাহাকে দিয়া গেলাম, তাহা যেন আর ফিরাইয়া লইও না। তাহার নাম বলিব না, বলিলে হয় ত সে আর তাহা রাখিতে পারিবে না। সে দরিদ্র, সে অর্থলোভে আমার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহার ত কোনও অপরাধ নাই।

সে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল; তুমি যেখানে আছ, সেইখানে লইয়া গিয়াছিল। আমি দূর হইতে তোমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, সেইজন্য তুমি তাহা জানিতে পার নাই। ভাবিয়াছিলাম, দূর হইতে একবার নয়ন ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দেখিয়া আসিব, তাহা হইলেই আমার প্রাণের পিপাসা মিটিবে।

কে সে? কি করিয়া সে তোমার হৃদয় অধিকার করিল? সেও ত কালো। সে যদি সুন্দর হইত, তাহা হইলে আমার মনে ধাঁধাঁ লাগিত না। সে কি আমা অপেক্ষা সুন্দরী? আমার নয়ন বলিল, "না"।

সে কি আমা অপেক্ষাও তোমায় ভালবাসে? কখনই না। আমার মন বলিল, "কখনই না"। প্রিয়তম, তুমি আমার দেবতা আমার আরাধ্য, উপাস্য দেবতা; অন্য চিন্তা, অন্য ধ্যান আমার নাই। আমার সকল অঙ্গের কেশাগ্র হইতে নখ পর্য্যন্ত তোমার, তোমারই সেবায় নিয়োজিত। তবে কেন?

কেমন করিয়া সে তাহার কালো দেহ লইয়া তোমার চিরবাঞ্ছিত রূপের কাছে অগ্রসর হইল? কেমন করিয়া তাহার কুৎসিত আকার তোমার হৃদয়-মন অধিকার করিল? তাহার কোটরগত নয়নে বিষ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত, তাহা কি তুমি দেখিতে পাও নাই?

তোমাকে দেখিয়াছি, নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছি। তোমার—সে তোমার হৃদয়ে। আমিও তোমার, কিন্তু দূরে। তর্কের অধিকার নাই প্রভু, আর কিছু বলিব না। আমিই তোমার পথের কণ্টক—আমিই তোমার সুখের পথে বাধা। সে কণ্টক, সে বাধা রাখিব না প্রভু, তুমি ফিরিয়া আসিও।

যাহাকে লইয়া সুখী হইয়াছ, তাহাকে লইয়া আসিও। তাহাকে লইয়া তোমার গৃহে, তোমায় মন্দিরে ফিরিয়া আসিও। তুমি যেমনটি চাহিতে, যেখানে যাহা ভালবাসিতে, আমি তেমন করিয়া সেইখানে তাহা সাজাইয়া রাখিয়া যাইব। তুমি ফিরিয়া আসিও।

অধিকারে বঞ্চিতা

দেবতা! কালোর হৃদয়-বেদনা কি একদিনের তরেও তোমার সিংহাসন কম্পিত করে নাই? একদিন, এক মুহূর্ত্তের তরেও কি তাহাকে মনে পড়ে নাই? আমি চলিলাম, আর তোমাকে দেখিতে পাইব না, ইহাই দুঃখ। হে বাঞ্ছিত, হে দুর্লভ, যদি কোন দিন মনে পড়ে, হে পাষাণ, যদি তোমার পাষাণ হৃদয় কোনও দিন বিগলিত হয়, তাহা হইলে ঐ মেজের পার্শ্বে শুভ্র মর্ম্মের শীতল গৃহতল একবার আলিঙ্গন করিও। কালো হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা, চিরজীবনের সঞ্চিত প্রেমরাশি, তোমার বক্ষঃস্থল মনে করিয়া ঐ শুভ্র, কঠিন, শীতল, চেতনা-হীন পাষাণে ঢালিয়া রাখিয়া গেলাম। বিশ্বজগতের যে স্থানে যেভাবে থাকি, আমার হৃদয় শীতল হইবে।

হে নিষ্ঠুর! কোনও দিন যদি আমার কুৎসিত আবরণ স্মরণ করিয়া তোমার নীলাভ নয়নকোণে জলবিন্দু সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহা ঐ পাষাণের উপরে ফেলিও, আমার কালো হৃদয়ের দারুণ জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে।

তুমি আসিও, তোমার শুভ্র চরণ আমার যেন মর্ম্মরের গৃহতল স্পর্শ করে। যেখানে অসহ্য জ্বালায় অস্থির হইয়া আমার কালো বুক দিয়া কঠিন পাষাণ আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া থাকিতাম, একবার তোমার শুভ্র কোমল চরণ দুখানি তাহার উপরে রাখিয়া দাঁড়াইও।

আমি চলিলাম, তুমি আসিও। হে দেবতা! তোমার শূন্য মন্দির আসিয়া পূর্ণ করিও।

তোমার জীবনে মরণে
কালো।

চ

'ঠাকুরঝি,

আজ সব শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ কয়দিন ধরিয়া বৌটাকে দেখিতে পাই নাই। সকালবেলায় দেখি ঘরময়, বাড়ীময় লোক। পড়িবার ঘরে মেজের পায়ার কাছে বৌটি নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে, তখনও শুইবার খাটে শুক্‌নো ফুলের মালা ঝুলিতেছে, ঘরময় শুক্‌নো ফুল, এককোণে সাত দিনের বাসি খাবার ঢাকা পড়িয়া আছে, আর সেই কালো বিড়াল আর ছোট বেঁজিটা বাড়ীময় কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

বৌটা জুড়াইয়াছে, কিন্তু আমার চক্ষে কেবল জল আসিতেছে। আহা, সব ফুরাইল, অভাগিনী জ্বলিতে আসিয়াছিল, চিরজীবন জ্বলিয়াই গেল, জীবনে আর সুখ-শান্তির মুখ দেখিতে পাইল না। আর এ পাড়ায় থাকিব না!, তোমার দাদাকে বলিয়া কহিয়া কালই চলিয়া যাইব।

তাহাকে বাহির করিয়াছে; বারান্দায় দেখিতে গেলাম।

অধিকারে বঞ্চিতা

উনি সবে আপিস্ হইতে আসিতেছেন। হাতীর দাঁতের খাটে তাহাকে শোয়াইয়াছে, পরণে বেনারসী শাড়ী, হাতে দুগাছি শাঁখা, কপালভরা সিন্দূর; মাথায়, গলায়, হাতে আর খাটে রাশি রাশি ফুল। আজ যেন তার বাসর! বৌটি যেন ঘুমাইয়া আছে, মুখখানি এখনও তেমনই ঢলঢলে হাসিহাসি আছে। হরি-সংকীর্ত্তন আসিল, দেশের লোক আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, —ভাবিলাম স্বামী-পুত্র রাখিয়া যদি এমন করিয়া মরিতে পারি!

এই সময় ভোঁ-ভোঁ করিয়া একখানা মোটরকার না কি গাড়ী সেই পথ দিয়া গেল। তাহাতে দিব্য সুন্দর একটি বাবু, আর তাহার পাশে জুতা-মোজা পরা একটা কালকিষ্টে মেয়ে। তোমার দাদা বলিলেন, "ঐ দেখ, ঐ বেটীর স্বামী—।" মরণ— মুখে আগুন!

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিবোল দিতে দিতে বৌটিকে লইয়া গেল।

তোমার স্নেহের
ছোট-বৌ।

গুম্ফ বধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বোতলের লঙ্কার আচারটি ফুরাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তেলটুকু পড়িয়াছিল। আমার দিদিশ্বাশুড়ী পাকা গৃহিণী; তিনি অপচয় দেখিতে পারেন না; সেই জন্য তৈল সমেত আচারের বোতলটি তাঁহার পোষাকের আলমারীর পিছনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভাণ্ডারে দামী জিনিস থাকে না, থাকিলে চুরি যায়। একবার একটা ঘিয়ের টিন শাল-দোশালার সিন্ধুকে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার জন্য শালগুলি কাচাইতে দুই-তিন শত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল। আর একবার ভাল সন্দেশ আসিয়াছিল, তাহা চাউলের জালায় তুলিয়া রাখিয়াছিলেন; পর দিন আমাদের সংসারের ভাত এত মিষ্ট হইয়াছিল যে, কেহ তাহা মুখে তুলিতে পারে নাই।

রাজু ঝি তাহার মসীবিনিন্দিত বর্ণ উজ্জ্বল করিবার জন্য একটু তেঁলের সন্ধানে ফিরিতেছিল। আলমারীর পার্শ্বে পূরা একটি বোতল সোণার বরণ সরিষার তৈল দেখিতে পাইয়া সে

আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; বোতলটি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া নীচের ঘরে রাখিয়া আসিল, এবং যথাসময়ে আধবোতল তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতে গেল।

দিদিশ্বাশুড়ী পূজা শেষ করিয়া রন্ধনে বসিয়াছেন, আমি কুটনা কুটিতেছি, রাজু বাটনা বাটিতেছে। এমন সময় রাজুর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। পূর্ব্বদেশের পঞ্চাশটী লঙ্কা একবৎসর-কাল তৈল মধ্যে বাস করিয়া সস্নেহে সমস্ত তেজটুকু তৈলকে অর্পণ করিয়া গিয়াছিল;—রাজুর কাল অঙ্গে তাহার ফল ফলিতেছিল। সহসা রাজু শিল ছাড়িয়া উঠিল; বলিল, দিদি-মা তুমি সাক্ষাৎ দেবতা,—তোমার মন্নি বড় লেগেছে। ও মা জ্বলে মনু গো,—"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজু, তোর কি হয়েছে?" দিদিশ্বাশুড়ী বলিলেন, "আমি তোকে শাপ-মন্নি দিতে যাব কেন?" রাজু তখন দরদালানে লুটাইতেছে আর বলিতেছে, "ও রে বামুনের জিনিস কেন চুরি করেছিনু রে—ও রে বাবা রে গেনু রে!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজু, আমার কি চুরি করেছিস?" রাজু বলিল, "ও মা, তোমার নয় মা; তোমার ত কত জিনিষই চুরি করি, এমন ত কখন হয় না,—ও গো গেনু গো—বাবুর আরসী-আলমারীর পিছন দিকে এক বোতল তেল ছিল, তাই থেকে একটু মেখেছিলু গো"—

দিদিশাশুড়ী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ও মা, সে যে খোকার লঙ্কার আচারের বোতল।" আমি কথা কহিব কি, তাহা শুনিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িলাম। বিহারী চাকরের সহিত রাজুর চিরকালের বিবাদ; সে রাজুর দুর্দ্দশা দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইল এবং দিদিশাশুড়ীকে কহিল, "দিদিমা, মাগী ভারী চোর। মার মাথার সোণার কাঁটা ওই নিয়েছিল।" রাজু তাহা শুনিয়া বলিল, "ও গো, নিয়েছিনু গো, ও মা তোমার পায়ে পড়ি, কাল ফিরিয়ে দিয়ে যাব, এখন বাঁচাও মা"—

এই সময়ে বাড়ীর দুয়ারে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, আর খোকা নাচিতে নাচিতে আসিয়া বলিল, "ও মা, বড়মাসী আর ছোটমাসী এসেছে।" তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার দুই ভগিনী আসিয়া উপস্থিত। তাহাদিগকে দেখিয়া রাজুর শোক দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সে বিনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "ও গো মাসীমারা, দিদিমার মন্নি বড্ড নেগেছে; তোমরা একটু পায়ের ধূলো দাও বাছা!" লতিকা আর অমিয়া রাজুর তৈল-চুরির কথা শুনিয়া আমার গায়ে লুটাইয়া পড়িল। রাজু তাহা দেখিয়া বলিল, "ও গো হাস কেন গো, আমি যে জ্বলে গেনু গো!" লতিকা বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিল, "রাজু তোর ভালই হয়েছে,

রংটা একটু ফর্সা হবে।" রাজু তাহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল এবং ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি না কি মাসীমা? তাহ'লে আবার মাখ্‌বো।" আমার দিদিশ্বাশুড়ী রাগিয়া বলিলেন, "মর্ পোড়ারমুখী, একদিন মেখে দাপিয়ে বাড়ী মাথায় করেছিস; আবার মাখ্‌বি, দূর হ।" তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; কারণ, এই সময় ভূপেন আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

লতিকা ঘোমটা, টানিয়া সরিয়া বসিল। আমি একখানা আসন পাতিয়া দিলাম। ভূপেনকে উপরে আনা হয় নাই বলিয়া দিদিশ্বাশুড়ী বকিতে লাগিলেন। রাজু বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল। ভূপেন বলিল, "দিদি-মা, কর্ত্তা দিদিকে আমাদের সঙ্গে মুসৌরী লইয়া যাইতে বলিয়াছেন, কাল 'তার' আসিয়াছে। দাদা কোথায়? দিদিশ্বাশুড়ী বলিলেন, "কি জানি ভাই, সারাদিনের মধ্যে তার তো চুলের টিকি দেখ্‌তে পাইনে, কোথায় গেছে।"

"কখন ফিরবেন?"

আমি বলিলাম, "বড় বেশী বিলম্ব নাই।"

"তবে আমরা একটু বসিয়া যাই।"

বলিতে-বলিতে তাঁহার জুতার শব্দ পাইলাম। বড় খোকা বলিয়া উঠিল, "মোসোমশাই, ঐ বাবা এসেছে।" লতিকা আর

অমিয়া তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিয়া আমার ঘরে গিয়া লুকাইল। তিনি যেই ঘরে প্রবেশ করিবেন, এমন সময় দুই দিক হইতে দুইজন খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনি ত অপ্রস্তুত! লতিকা বলিল "মুখুয্যে মশাই, আপনি কেমন লোক, আমরা একঘণ্টা আপনার জন্য বসিয়া আছি।"

"গোস্তাকি মাফ্ হয় বেগম-সাহেব, গোলাম তো সর্ব্বদাই হাজির আছে। দুইপ্রহর বেলায় যে অধমের কুটীরে চন্দ্রাবলির উদয় হইবে, তাহা কেমন করিয়া জানিব? বলি সে তাম্বূল-করঙ্ক-বাহকটা কোথায় গেল? বেগম-সাহেব, কি সেটাকে জবাব দিয়াছ?"

অমিয়া বলিল, "জবাব দিলে কি সে যাইতে চাহে? তিনি ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়াছেন। বড়দির সঙ্গে আর দিদিমার সঙ্গে গল্প কচ্ছেন।"

আমার বোন দুইটী সুন্দরী। যেমন তেমন সুন্দরী নয়, তেমন রূপ দেশে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দুই বৎসর পূর্ব্বে লতিকার বিবাহ হইয়াছে। ভূপেন একটু কালো; কিন্তু তাহার মত মুখশ্রী লতিকা বা অমিয়া কাহারও নাই। তথাপি সে লতিকার পদানত! উনি তাহার নাম রাখিয়াছেন লতিকার তাম্বূল-করঙ্ক-বাহক। ভূপেন আমাদের বড় বাধ্য। তাহার মত শান্ত, সুশীল, সচ্চরিত্র যুবাপুরুষ সচরাচর

দেখিতে পাওয়া যায় না; আর আমার ইনি, দিন নাই, রাত্রি নাই, কেবল বই লইয়াই আছেন। হয় উপনিষদ, নয় দর্শন, আর নয় হার্ব্বট স্পেনসার তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। বাড়ীতে একটা কাজ পড়িলে আমার ভাইয়েরা আসিয়া উদ্ধার করে।

উনি ভূপেনকে ডাকিলেন। ভূপেন আসিল, লতিকা মাথার কাপড় টানিয়া পলাইল। উনি হাসিয়া বলিলেন, "চন্দ্রাবলি, যাও কেন?" লতিকা এক দৌড়ে দিদিমার নিকট আশ্রয় লইল। তখন তিনি ভূপেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ভূপেন, এখন কি রাজকার্য্যে, না নিজ-কার্য্যে?" রাজকার্য্যটা লতিকার কার্য্য, নিজ-কার্য্যটা ঘুরিয়া বেড়ানো। ভূপেন বিবাহের পূর্ব্বে না কি সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইত। ভূপেন বলিল, "দাদা, কর্ত্তা দিদিকে আমাদের সহিত মুসৌরী লইয়া যাইতে লিখিয়াছেন। আমরা বুধবারে যাইব। আপনিও যাইবেন না কি?"

"আমাকে তো আর যাইতে লেখেন নাই। তিনি যখন লিখিয়াছেন, তখন তাঁহার কন্যা অবশ্যই যাইবেন।"

"আমাকে ত যাইতে লেখেন নাই; আমি যাইতেছি কেন?"

"বয়সের ধর্ম্ম, অথবা চাকরীটি যাইবার ভয়ে।"

"বলি দাদার চাকরীটি কি অটুট?"

"সে ত অনেক দিন গিয়াছে ?"

"সে কি ? কবে গেল ?"

"ঠাকুরাণী যবে হইতে বচনবাগীশ হইয়াছেন।"

"আপনি যাইবেন কি না বলুন।"

"নিশ্চয় না। আমি কি তোমার মত গাড়ু-গামছা বহিয়া লইয়া যাইব ? তোমরা কে-কে যাইতেছ ?"

"আমরা দুইজন,—"

"সে ত বটেই। আর কে যাবে ?"

"অমিয়া যাইবে।"

"তাহার বিবাহের সম্বন্ধের জন্য এখানে রাখা হইয়াছিল, সম্বন্ধ ত হইল না, ইহার মধ্যেই লইয়া যাইবে কেন ? পুরুষ-মানুষ আর কে যাইবে ?"

"আমার এক বন্ধু।"

"বয়স কত ?"

"একুশ-বাইশ।"

"সর্ব্বনাশ ! বর্ণ কি ?"

"ব্রাহ্মণ।"

"আরে সে বর্ণ নয়, গায়ের বর্ণ।"

"কনক-চাঁপার মত।"

"আরও সর্ব্বনাশ ! কবিতা লেখা অভ্যাস আছে ?"

"তাহা বলিতে পারি না।"

ঠাকুরটির রঙ্গ দেখিলে অঙ্গ জ্বলিয়া যায়। ভূপেনের বন্ধু আর যাইবার সময় পায় নাই?

"ভূপেন, তোমরা কবে যাইবে?"

"বুধবার পঞ্জাব-মেলে।"

"ওরে বিহারী, ফৌজদারী-বালাখানার দুইসের তামাক কিনে আন, আর বিছানার ব্যাগটা বাঁধিয়া রাখ্।"

"কেন? দাদা, কোথায় যাইবেন?"

"জমিদারী রক্ষা করিতে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অঙ্কুর

প্রফুল্ল ছেলেটি বেশ। রূপে কার্ত্তিকও নয়, অথচ কুৎসিত, কদাকারও নয়। পোষাক-পরিচ্ছদও ভাল। দোষের মধ্যে গোঁফ্‌টি কামানো। আমি গোঁফ্ কামানো, মেয়েমুখো পুরুষ একেবারে দেখিতে পারি না। ভূপেনের মুখে শুনিয়াছি যে, তাহার অবস্থা খুব ভাল, অথচ পোষাকের কোন আড়ম্বর নাই। কেবল চোক দুইটি চারিদিকে ঘুরিতে থাকে; সেটা পুরুষ-জাতির স্বভাব।

আমরা কাশীতে আসিয়াছি। সকাল হইতে মনটা ভার হইয়া আছে; কারণ, আমার সুরতির কৌটাটি চুরি গিয়াছে। কে চুরি করিয়াছে, তাহা জানি। পাছে সে সাবধান হইয়া যায়, সেইজন্য কিছু বলি নাই। ফৌজদারী-বালাখানার তামাকের টিনটা চুরি করিতে গিয়াছিলাম, খুঁজিয়া পাই নাই। চোর যদি শীঘ্র সুরতির কৌটাটি ফিরাইয়া না দেয়, তাহা হইলে গড়গড়ার নলটি ভাঙ্গিয়া দিব।

আহারের পরে 'সারনাথ' দেখিতে যাইব। ভূপেন তৈল মাখিতেছে, উনি তামাক টানিতেছেন, আর প্রফুল্ল দাড়ি

কামাইতে বসিয়াছে। আমি দালানের দুয়ারের পার্শ্বে বসিয়া পান সাজিতেছি। শশী সরকারকে সুরতি আনিতে চকে পাঠাইয়াছি; সে না আসিলে যাইব না। ভুপেন বলিল, "প্রফুল্ল, গোঁফ্‌টা রাখ না কেন?" প্রফুল্ল বলিল "ছি, বড় বিশ্রী দেখায়।" কিসে বিশ্রী দেখায়, কিসে সুশ্রী দেখায়, তাহা যদি পুরুষেরা বুঝিত!

ভুপেন উহাকে জিজ্ঞাসা করিল "সারনাথে যাইবেন, দিদি হাঁটিতে পারিবেন ত?" ঠাকুরটি বলিলেন "তোমার দিদি আর টমি কুকুর বেঙের মত থপ্‌-থপ্‌ করিয়া চলিবেন।"

"কতদূর চলিবেন?"

"এই দুইচারি কদম।"

"আর আপনি পিছন হইতে নকল করিবেন ত?"

"আমার স্বভাব বড়ই উদার। দেখ ভাই, অমন সুন্দর গজেন্দ্র-গমন দেখিলে আমি নকল না করিয়া থাকিতে পারি কই?"

"তাহার পরে কি হইবে?"

"তুমি আর আমি কাঁধে করিয়া লইয়া আসিব।"

"আপনি দিদির নিন্দা করিতেছেন, আমি তাঁহাকে বলিয়া আসি।"

"ভায়া, তোমার কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে না। তিনি উৎকর্ণ হইয়া দুয়ারের পার্শ্বে বসিয়া আছেন।"

"কি করিতেছেন ?"

"তাঁহার পেশা। শশী সরকার একটা পানের বরজ কিনিয়া আনিয়াছে, তিনি সারনাথের রসদ বোঝাই করিতেছেন।"

প্রফুল্ল বলিয়া উঠিল "দিদি যদি জুতা পরিয়া যান, তাহা হইলে অত কষ্ট হয় না।" ঠাকুরটি বলিলেন "ভায়া, বরবপুখানি ত দেখিয়াছ ? বিবাহের সময় দুইখানি মহাপায়া জোড়া দিতে হইয়াছিল।"

ভূপেন হাসিয়া উঠিল। ঠাকুরটি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, একটু শাসন করিতে হইবে।

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "কি পোষাক পরিয়া যাইবেন ?"

ঠাকুর। এই চুড়িদার পায়জামা, সলুকা, পেশোয়াজ, আর ওড়না।

প্রফুল্ল। সর্ব্বনাশ! মেয়েরা কি সকলেই এই পোষাক পরিয়া বাহির হইবেন ?

ঠাকুর। বোধ হয়।

ভূপেন। শুনিস্ কেন দাদার কথা। ঐ রকম সঙ সাজিয়া কোন ভদ্রলোকের মেয়ে পথে বাহির হইয়া থাকে ?

লোক দেখিলে দাদার রঙ্গ বাড়ে। আজ তোমাকে পাইয়াছেন কি না, সেইজন্য শশী সরকার এক বরজ পান আনিয়াছে, সারনাথে গরুর গাড়ী করিয়া পান যাইবে।

প্রফুল্ল। মেয়েরা তবে কি কাপড় পরিয়া যাইবেন?

ভূপেন। কাপড় পরিবে কেন? যোধপুর ব্রিচেস, আর কর্কের হ্যাট পরিয়া যাইবে।

প্রফুল্ল। কাপড় পরিয়া চলিতে কষ্ট হইবে।

ভূপেন। তোর যখন বিবাহ হইবে, তখন বৌকে গাউন পরাইয়া বেড়াইতে লইয়া যাস্।

প্রফুল্ল। মেয়েরা স্কার্ট পরিলে বেড়াইতে অত কষ্ট হয় না।

ঠাকুর। প্রফুল্ল ভায়া, অমিয়া লোরেটো কন্‌ভেণ্টে পড়িত। তাহার দুটা-একটা স্কার্ট পাওয়া গেলেও যাইতে পারে; কিন্তু তোমার দিদির ত নাই! আমার একখানা পুরাণো বিলাতী কম্বল আছে, সেখানা দড়ি দিয়া কোমরে বাঁধিয়া দিলে হবে না?

ভূপেন। দেখুন দাদা, অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। দিদির হুকুমে মাসে কয়বার হল-এণ্ডারসনের দোকানে ছুটিতে হয়?

প্রফুল্ল। স্কার্ট পরিলেই ভাল হইত।

ভূপেন। আমি কথাটা বলিয়া আসি।

ঠাকুর। ভূপ, আমার কথাটা বলিও না ভাই; তোমাকে

বাদলরামের দোকানের টাকায় এক খিলি পান খাওয়াইয়া দিব।

ভূপেন উঠিল, দরজার নিকটে আসিয়া ডাকিল "দিদি!" আমি সকল কথাই শুনিতেছিলাম। ভূপেন আসিতেই বলিলাম, "আমরা সব কথাই শুনিয়াছি। দূত, তোমাকে আর সাধু সাজিতে হইবে না।" লতিকা টিফিন্ বাক্স গুছাইতেছিল, সে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বলিল, "দিদি, জিজ্ঞাসা কর ত, আমরা কি কাপড় পরিয়া যাইব, সে খবরে প্রফুল্ল বাবুর দরকার কি?" ভূপেন বলিল "আমি কি জানি?" আমি তখন ভূপেনকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভূপেন, তোমার বন্ধু বিবাহ করেন নি কেন?"

ভূপেন বলিল, "সুন্দরী পাত্রী মিলে নাই বলিয়া।"

"সারা বাঙ্গালা মুলুকে মনের মত পাত্রী জুটিল না?"

"কই আর জুটিল?"

"কেন, লতিকা, অমিয়া কি কুৎসিত?"

"সে কথা কতবার বলিয়াছি। প্রফুল্ল বলে যে 'তুই অন্ধ, স্ত্রৈণ, তুই রূপের কথা কি বুঝিস?' "

"বটে? ও কথা এতদিন বল নাই কেন? তোমার বন্ধুর দর্পচূর্ণ করিয়া দিতাম। আমার ভগিনীদের রূপ জগৎ-বিজয়ী।"

"দিদি, সে আর একবার! এই দেখুন না, দাদা কেমন জহাঙ্গীর বনিয়া আছেন!"

ঠাকুরটির সঙ্গে থাকিয়া ভুপেন কথা শিখিতেছে!

"আপনারা কি পরিয়া যাইবেন?"

"সে খবরে তোমার দরকার কি? আমরা তিন বোনে পেশোয়াজ পরিয়া, পায়ে ঘুমুর দিয়া সারনাথে মজুরা করিতে যাইব!"

ভূপেন আমার বাক্যবাণ সহিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল। তখন আমি লতিকাকে বলিলাম "দেখ ভাই, প্রফুল্লর সঙ্গে অমিয়া কেমন মানায়?" লতিকা বলিল "বেশ মানায়। আমি কতদিন বলিয়াছি; কিন্তু নিজে বলে, সে বাঙ্গালীর মেয়ে বিবাহ করিবে না।"

"ছেলেবেলায় পুরুষ মানুষে অনেক কথাই বলিয়া থাকে। সকল কথা কি গায়ে মাখিতে আছে? তোর মুখুয্যে মশাই না কি বলিত যে, কষিত কাঞ্চনের মত বর্ণ না হইলে বিবাহ করিবে না।"

"দিদি, তুমি বুঝি কালো?"

"যা, যা, তোর আর রূপ-বর্ণনা কর্‌তে হবে না। এখন যা বলি, তাই শোন্। বাবা তো বিবাহের জন্য অমিয়াকে কলিকাতায় রাখিয়াছিলেন; অনেকে দেখিয়াও গিয়াছে, কিন্তু

বিবাহ ত হইল না। প্রফুল্লর সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্ব্বে, অমিয়ার সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধটা পাকা-পাকি করিয়া তুলিতে হইবে।"

"কেমন করিয়া?"

"দেখ্ না। অমিয়া?"

অমিয়া আসিল। সে স্নান করিয়া চুল শুকাইতেছিল। তাহাকে লইয়া ভিজা চুলগুলাকে আল্‌গা বেণী বাঁধিয়া দিলাম। একটা ফিরোজা রঙ্গের হাতকাটা ব্লাউস পরাইয়া তাহার উপরে গোলাপী রঙ্গের বেনারসী সাড়ী পরাইয়া দিলাম। তাহাকে বলিয়া রাখিলাম যে, বুটের বদলে দিল্লীর জরিদার নাগরা পরিয়া যাইবে। লতিকা আর আমি এক-একখানা মোটা বিলাতী কাপড় পরিয়া, বিছানার চাদর মুড়ি দিয়া বসিলাম।

গাড়ী আসিল, আমরা উঠিলাম। আমাদের দেখিয়াই ঠাকুরটি বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন। দশ মিনিট পরে দেখি, বিহারী একহাতে জলের কুঁজা, আর এক হাতে তিনটা বালিশ, বগলে দুই তিনখানা মাদুর ও ঠাকুরটি এক বোতল গোলাপ-জল, একটা স্মেলিং-সল্টের শিশি, ছয়টা ছাতা, ও তিনখানা পাখা লইয়া আসিতেছেন।

লতিকা ত হাসিয়াই আকুল। গাড়ীতে উঠিয়া ঠাকুরটি

বলিলেন, "ও রে বিহারী, একখানা পাখা ভুল হইয়াছে। আজ যে প্রফুল্ল বাবু মূর্চ্ছা যাইবেন।"

সারনাথে গিয়া দেখিলাম, চারে মাছ আসিয়াছে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পল্লব

অমিয়া বড় একগুঁয়ে, সে কোন মতেই মাথার কাপড় ফেলিয়া প্রফুল্লর সম্মুখে বাহির হইবে না। লোরেটো কনভেন্টে পড়িয়া সে আমার মাথা আর মুণ্ড শিখিয়াছে। আমার ঔষধ ধরিয়াছে। অমিয়া যদি একদিন মাথার কাপড় খুলিয়া বাহির হয়, আগুল্‌ফচুম্বিত কেশরাশি প্রফুল্ল যদি একদিন দেখিতে পায়, তাহা হইলে একমাসের মধ্যে বরকনে বরণ করিয়া ঘরে তুলি। বোনটি আমার যেমন-তেমন সুন্দরী নয়। তরুবালার অখিল একবার দেখলে হয়!

আজ প্রতিশোধ লইয়াছি, লক্ষ্নৌ আসিবার সময় গড়গড়ার নলটি চুরি করিয়াছি। সেইজন্য ঠাকুরটি আজ বড় নরম। আমি ত ঠাকুরটিকে চিনি। চৌদ্দ বৎসর একসঙ্গে ঘর করিতেছি। এবারে জব্দ না করিয়া ছাড়িব না। গড়গড়ার নল কোথায় গিয়াছে, তাহা ভূপেন বুঝিতে পারিয়াছে।

রেলে লতিকাকে বলিলাম "লতি, দেখিয়াছিস্?" লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "দেখিয়াছি।" ভূপেন আমাদের

কথা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেল, কিছুই বুঝিল না। ঠাকুরটি সিগারেট মুখে করিয়া ঢুকিতেছিলেন, কিন্তু কথা বাদ যাইতেছিল না।

ভোরের বেলায় গাড়ী ছাড়িয়াছিল। সে দিন কাহারও দাড়ি কামানো হয় নাই। বাসায় পৌঁছিয়া ঠাকুরটি গড়গড়ার নল কিনিতে ছুটিলেন, কারণ, শশী সরকার নল চিনে না। ভূপেন ও প্রফুল্ল কামাইতেছিল। সেই দিন প্রফুল্লর কথা শুনিয়া ভূপেন একটি কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিল ; সে দাড়ির সহিত গোঁফটি কামাইল। তাহা দেখিয়া আমি ও লতিকা তিনহাত ঘোমটা টানিয়া বসিয়া রহিলাম। ভূপেন লক্ষ্মৌ সহর দেখিবার পরামর্শ করিতে আসিয়া বিপরীত অবগুণ্ঠন দেখিয়া প্রমাদ গণিল। অনেক সাধ্য-সাধনার পরেও যখন আমরা কথা কহিলাম না, তখন সে অমিয়ার আশ্রয় লইতে গেল। অমিয়াও দয়া করিল না, সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া পলাইল। ভূপেন বিষণ্ণবদনে বাহিরে যাইতেছে দেখিয়া, আমি বড় খোকাকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইলাম "আপনি কে? আপনি কেমন ভদ্রলোক? জিজ্ঞাসা না করিয়া অপরিচিত গৃহস্থের অন্দরে ঢুকিয়াছেন?" ভূপেন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "সে কি রে, বড়খোকা, আমি যে মেসো মশাই?" বড়খোকা হাসিয়া কোলে উঠিতে যাইতেছিল, আমি তাহাকে নিষেধ করিলাম।

সে আমার শিক্ষামত বলিল, "আমার মেসোমশাইয়ের গোঁফ আছে, আপনার তো গোঁফ নাই?" ভূপেন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চলিয়া গেল।

লক্ষ্ণৌ সহরে ভাল গড়গড়ার নল মিলিল না, আমার কর্ত্তাটি ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী ফিরিয়া দেখেন, ভূপেন আর প্রফুল্ল মুখটি চূণ করিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, ব্যাপার কি? লক্ষ্ণৌতে আসিয়াই যে মেঘাড়ম্বর?" ভূপেন বলিল, "দাদা, সর্ব্বনাশ করিয়াছি, প্রফুল্লর কথা শুনিয়া গোঁফ কামাইয়া মরিয়াছি; এখন বাড়ীতে আমায় কেহ চিনিতে পারিতেছে না।"

"কেহ না?"

"বড়-খোকা অবধি না।"

"আমার গড়গড়ার নলটি খুঁজিয়া দাও, তোমায় উদ্ধার করিতেছি।"

"সকল রোগের ঔষধ ঐ এক যায়গায়।"

"বটে, তবে একটু বিলম্ব হইবে। চল, বেড়াইয়া আসি।"

অমিয়া স্কুলে ছবি আঁকিতে শিখিয়া আসিয়াছিল, বেশ সুন্দর ছবি আঁকিত। ঠাকুরমা তাহাকে গোমতী নদীর চিত্র আঁকিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন; সে আজ গোমতীতীরে

ছবি আঁকিতে যাইবে। গাড়ী আসিয়াছে। আমি ও লতিকা মাথায় কাপড় টানিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছি, এমন সময় ঠাকুরটির আবির্ভাব। একহাতে পানের ডিবা, আর আমার সেই সুরভির কৌটা; আর একহাতে পিক্‌দানী, কাঁধে তোয়ালে আর বগলে পাখা। আমার সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া গেল। ভূপেন যদি আজ গোঁফ না কামাইত, তাহা হইলে ঠাকুরটিকে এই-খানেই দু'দশ কথা শুনাইয়া দিতাম।

পথে যাইতে যাইতে ভূপেন প্রফুল্লর গাড়ীতে আর একদিকে চলিয়া গেল। আমরা গোমতী-তীরে গাড়ী হইতে নামিলাম। একটা পুরানো মস্‌জিদের চাতালে বসিয়া অমিয়া ছবি আঁকিতে লাগিল, আমি ও লতিকা তাহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। লক্ষ্ণৌতে তখনও বেশ গরম। ঠাকুরটি গলিয়া যাইবার ভয়ে মস্‌জিদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিগারেট ধরাইলেন। এমন সময় হাঁচিতে হাঁচিতে, কাসিতে কাসিতে ভূপেনের ও প্রফুল্লর প্রবেশ। চাহিয়া দেখি, ভূপেন কোথা হইতে থিয়েটারের সাজের একটা গোঁফ পরিয়া আসিয়াছে; তাহার চুলগুলা ভূপেনের নাকে ঢুকিতেছে, আর সে অনবরত হাসিতেছে। তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল গড়াইতেছে। ভূপেনের দুর্দ্দশা দেখিয়া অমিয়া হাসিয়া লতিকার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। লতিকা চাতালে লুটাইতে লাগিল। আমি আর

স্থির থাকিতে পারিলাম না। ভূপেনের নিকটে গিয়া বলিলাম, "ভাই, তোমার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে, লক্ষ্মীছাড়া গোঁফটা খুলিয়া ফেল।" তখন ভূপেন গোঁফ খুলিয়া, নাক মুছিয়া বাঁচিল।

ফিরিয়া দেখি প্রফুল্ল নিকটে নাই, সে দূরে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া পলকহীন নেত্রে চিত্রাঙ্কনরতা অমিয়াকে দেখিতেছে। দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। পিছন ফিরিয়া দেখি, পানের বাটা, সুরতির কৌটা লইয়া আমার ইষ্টদেব আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন "হুজুর, বেগম সাহেব্ গোলা-মের অপরাধ মাফ্ হয়, আমার নলটা ফিরিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।" পানের বাটার তলায় নলটা লুকানো ছিল, তাহা বাহির করিয়া দিলাম। প্রফুল্লর তখনও দেখা শেষ হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কোরক

ভূপেন আবার গোঁফ রাখিয়াছে। এই ঘটনাটির পর ভূপেন সম্পূর্ণরূপে শাসন হইয়া গিয়াছে। এইবার ঠাকুরটির পালা। প্রফুল্ল ধীরে ধীরে ধরা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইতেছিল। আজ হরিদ্বার আসিয়াছি। সকালবেলায় বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। পাহাড়ের নিকটে আসিয়াছি বলিয়া সকলেই গরম পোষাক পরিয়াছি।

কোন তীর্থেই স্নান করিতে দিবে না, সুতরাং সকালবেলায় ব্রহ্মকুণ্ডে অথবা কন্‌খলে গিয়া কি করিব? গঙ্গার খাল দেখিতে গেলাম। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, রৌদ্রের তেজ ততই বাড়িতে লাগিল। বেলা যখন দশটা, তখন ভীষণ গরম, সকলেরই পোষাক ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। বাসায় ফিরিলাম। দুই মিনিট পরে দেখি প্রফুল্ল কাপড় ছাড়িয়া মুখময় একটা সাদা গুঁড়া মাখিয়াছে। লতিকা বলিল, "পাউডার"। কিন্তু আমার বিশ্বাস হইল না। ক্ষণেক পরে দেখি ঠাকুরটি

ঘন-ঘন পিঠ চুলকাইতে-চুলকাইতে বাহিরে আসিলেন, এবং প্রফুল্লর মুখ দেখিয়াই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভায়া, রংটা হঠাৎ ফর্সা হয়ে গেল যে ?"

প্রফুল্ল বলিল, "ঘামের জন্য পাউডার মাখিয়াছি।"

"পাউডারে কি ঘামাচি সারে ?"

"বেশ সারে।"

"ভায়া, আমাকে একটু দিতে পারো ?"

প্রফুল্ল পাউডার আনিল, বিহারী অঙ্গময় তাহা লাগাইয়া দিল। তখন প্রফুল্লকে ও তাঁহাকে রামযাত্রার ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় দেখাইতেছিল।

অমিয়া বলিল "ছি, পুরুষ মানুষে বুঝি পাউডার মাখে ?" ফিরিয়া দেখি, অমিয়া ও লতিকা রঙ্গ দেখিতেছে। লতিকা বলিল, "মুখুয্যে মশাই আসিলে জিজ্ঞাসা করিব, তাঁর কি রঙ ফর্সা হইয়াছে ?" অমিয়া কহিল, "কিছু বলিও না মেজ দি, প্রফুল্ল বাবুর চাকর গোপাল আমার বড় অনুগত, দেখ না কাল কি দুর্দ্দশা করি।" আমি মনে-মনে বলিলাম, "মনিব যখন অনুগত, তখন চাকর যে অনুগত হইবে, সে আর অধিক কথা কি ? লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি করবি বলনা ভাই ?" অমিয়া কথা ভাঙ্গিল না, বলিল "কাল সকালেই দেখতে পাবে।"

এই সময়ে ভূপেন বাড়ীর ভিতরে আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভূপেন, কাল কোথায় যাবে?" ভূপেন বলিল, "শেষ রাত্রিতে হৃষীকেশ যাব।" সেখানে খাওয়া-দাওয়া করিয়া সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিব। ব্রাহ্মণ, চাকর আর একখানা টঙ্গা লইয়া আজ সন্ধ্যাবেলায় চলিয়া যাইব। কিন্তু দিদি, প্রফুল্ল কিছুতেই থাকিতে চাহিতেছে না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন? কি হইয়াছে?"

"সে বলে তাহার মন কেমন করিতেছে। যখন আসিয়াছিল, তখন বলিয়াছিল যে সে দেশে-দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে; যে দেশে অপ্সরার মত সুন্দরী মিলিবে, সেই দেশে বিবাহ করিবে। এখন সে বলে যে, তাহার বিবাহ করিবার স্পৃহা ঘুচিয়া গিয়াছে।"

মনটা হঠাৎ দমিয়া গেল। ভূপেনকে বলিলাম, "তাও কখন হয়? এতদূর আসিয়া মুসৌরী না দেখিয়া কখন ফেরা যাইতে পারে না ভূপেন, তুমি প্রফুল্লকে বুঝাইয়া বল। সে আমার ছোট ভাইটীর মত, তুমি আমার নাম করিয়া অনুরোধ কর, সে নিশ্চয় রক্ষা করিবে।" ভূপেন বাহিরে গেল, আমি ভাবিতে বসিলাম। কি হইল? ভগবান কি বিমুখ হইলেন? এমন সময় ভূপেন ফিরিয়া বলিল, "দিদি, আপনার খাতিরে সে ডেরাডুন পর্য্যন্ত যাইবে, কিন্তু সে কোন মতেই মুসৌরী

যাইতে চাহেনা।" কি করিব, একমনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যাবেলায় যখন ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে বেড়াইতে গেলাম, তখন দেখিলাম যে প্রফুল্লর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু দৃষ্টি তখনও অমিয়ার দিকে নিবদ্ধ। বাবার পত্র আসিয়াছে। ডেরাডুনে বড় কলেরা হইতেছে ; সেখানে অপেক্ষা করা হইবে না।

শেষ রাত্রিতে টঙ্গায় চড়িয়া হৃষীকেশ চলিয়াছি। এক গাড়ীতে আমরা তিন ভগিনী। আর এক গাড়ীতে ভূপেন ও ছেলেরা। তিন নম্বর গাড়ীতে উনি আর প্রফুল্ল। আর শেষের গাড়ীতে চাকরেরা। গাড়ীতে উঠিয়া অবধি অমিয়া কেবল আপন মনে হাসিতেছে। রৌদ্র উঠিলে গাড়ী এক জায়গায় দাঁড়াইল। ভূপেন হঠাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মুখ বাড়াইয়া দেখি, প্রফুল্লর মুখ রোদে রক্তবর্ণ হইয়াছে, আর ঠাকুরটী যেন লজ্জায় নীল হইয়া গেছেন। তাঁহার মুখময় নীল রঙ্গের পাউডার মাখানো। পথে জল মিলিল না, শুষ্ক নদীগর্ভ দিয়া সেই নীলবর্ণ আর লালবর্ণ মানুষ দুইটি হৃষীকেশের বাজারে পৌছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুসুম

আজ বিদায়ের পালা। প্রফুল্ল কোন মতেই থাকিবে না। তাহার চোখ দুটি সর্ব্বদাই জলে ভরা। ছেলেটি বেশ। ভগবান যে কি করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। লতিকা বলিয়াছে যে অমিয়ার শরীর ভাল নাই, রাত্রি হইতে কিছু খাইতেছে না। কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না।

বড়-খোকা আসিয়া বলিল যে, গোপাল একা দেশে ফিরিতে বড় ভয় পাইতেছে। ভূপেন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে একা ফিরিবে কি রকম?" গোপাল আসিয়া বলিল, "বাবু আমাকে সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া একা দেশে ফিরিতে বলিয়াছেন!" ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, "তাহার সঙ্গে কি কোন জিনিষ থাকিবে না?"

"থাকিবে একটা ব্যাগ।"

"ব্যাগটা লইয়া আয়।"

ভূপেনের হুকুমে গোপাল ব্যাগ লইয়া আসিল। সেটা একটা চামড়ার ছোট ব্যাগ, তাহাতে তিনখানা বস্ত্র ধরে

কি না সন্দেহ। প্রফুল্ল তখন ঠাকুরটির সঙ্গে গাড়ী রিজার্ভ করিতে ষ্টেসনে গিয়াছে। এই অবসরে ব্যাগ লইয়া ভূপেন চাবি খুঁজিতে বাহির হইল। উহারা ফিরিয়া আসিবার পরে ভূপেন ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, হাত-পা ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। সে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া বলিল, "দিদি, সর্ব্বনাশ!" আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?"

ভূপেন ব্যাগ খুলিয়া দেখাইল, ব্যাগে দুইখানা গেরুয়া রঙ্গের কাপড়, একটী আলখাল্লা, অমিয়ার একখানা ফটোগ্রাফ, তাহারই একটা পুরানো রঙ্গের-শিশি, আর একটা শুক্না গোলাপ-ফুল। ভূপেন স্তম্ভিত, আমিও স্তম্ভিত। লতিকা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! বলিলেই হইত।" অমিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে,ভরা ভাদ্রের গঙ্গার মত তাহার দুইটি চক্ষু জলে টল-মল করিতেছে।

ভূপেন ব্যাগ লইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। গেরুয়া কাপড়, অমিয়ার ছবি, রঙ্গের শিশি ও মাথার ফুল দেখিয়া প্রফুল্ল মাথা হেঁট করিল। ঠাকুরটির মুখে কিন্তু বিস্ময় বা দুঃখের চিহ্নমাত্র দেখিলাম না। ভূপেন যখন জিজ্ঞাসা করিল, "গোপাল একা দেশে ফিরিবে, তোমার ব্যাগে গেরুয়া কাপড়, এ সকল কি ভাই?" তখন প্রফুল্ল ভূপেনকে জড়াইয়া

ধরিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইল। ঠাকুরটি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে লক্ষ্ণৌতে ভূপেন যে গোঁফটা কিনিয়াছিল, সেইটা বাহির করিয়া বলিলেন, "ভায়া হে, শ্বশুর-কন্যার সেবা করিয়া হাড় জর-জর হইয়াছে। ফটোগ্রাফ পূজা করিলেও হইবে না, গেরুয়া কাপড়েও হইবে না। তুমি ধাঁ করিয়া এই গোঁফটা পরিয়া ফেল দেখি, আমি পাঁজি আনিতে বলি!"

এমন মানুষও দেশে থাকে? প্রফুল্ল সত্য-সত্যই গোঁফ পরিল, এবং ঠাকুরটিকে একটা লম্বা-চওড়া প্রণাম করিল। লতিকা হাসিয়া আমার গায়ের উপরে ঢলিয়া পড়িল।

প্রফুল্ল গোঁফ রাখিয়াছে। ২৭শে আষাঢ়, বুধবার, গোধূলি-লগ্ন।

ননীর সাথী

জনশূন্য ক্যালকাটা রোডের পাশে একখানা পাথরের উপরে বসিয়া সিগারেট টানিতেছিলাম। ঘন কুয়াসায় পর্ব্বত উপত্যকা, বন ঢাকিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল যে, বদ্রাওনের নবাব-নন্দিনী এই বুঝি কুয়াসার যবনিকা সরাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল! সেদিন শরীরটা কেমন করিতেছিল বলিয়া টিপি-টিপি বৃষ্টি ও কুয়াসা সত্ত্বেও একটা 'বর্ষাতি' মুড়ি দিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। সিগারেটের রাশি রাশি ধূম কুয়াসার সহিত মিশিয়া গেল; কিন্তু তথাপি বদ্রাওনের নবাবনন্দিনী আসিল না দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিতেছিলাম, এমন সময় পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, "মেদ মামা, ও মেদ মামা, বাড়ী আয়।"

যেদিক হইতে শব্দ আসিল. সেইদিকে ফিরিয়া চাহিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে আবার শব্দ হইল, "মেদ মামা—আয় বাবা—আয় বাড়ী—আয়।" দেখিলাম, জলাপাহাড়ের রাস্তা দিয়া একটি জরাজীর্ণ, কঙ্কালসার

কুকুর লইয়া একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ চলিয়াছেন। কুকুরটি এক-কালে লোমশ ছিল, এখনও তাহার লেজে ও দেহের স্থানে স্থানে লোম লাগিয়া আছে। সেটি আকারেও বড় ভাল জাতের মনে হইল এবং এককালে দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিল। ভদ্র-লোকটি অত্যন্ত কৃশ ও দীর্ঘকায়; কিন্তু তাঁহার পোষাকটি বড়ই অদ্ভুত রকমের। একটি শাদা পরিষ্কার 'ফ্লানেলে'র কামিজের উপরে একটি মলিন, শতছিন্ন, শাদা চাপকান, তাহার উপরে একটি ততোধিক জীর্ণ শালের চোগা, তাহার উপর বিবর্ণ, বোতামশূন্য 'ওয়েষ্ট কোট' এবং সকলের উপর একটি নূতন 'ওভার কোট'—সকল জামার বোতাম খোলা। তাঁহার এক পায়ে বাদামী রংয়ের বুট, কিন্তু আর এক পায়ে ছেঁড়া, শাদা 'ক্যাম্বিসে'র জুতা। ময়লা, শাদা মোজা দুইটা ঢিলা হইয়া জুতার উপরে উল্টাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধের একহাতে বেতের একগাছি মোটা লাঠি ও আর একহাতে কুকুরের গললগ্ন শিকল। বুড়া কুকুরটিকে অত বড়, মোটা একগাছি শিকল দিয়া বাঁধিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বৃদ্ধ আমাকে দেখিতে পাইলেন না। পথের ধারে 'রেলিং' ধরিয়া দাঁড়াইয়া ভগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন, "মেদ মামা—আয় বাবা—বাড়ী আয়—আর কখনও কিছু বলব না—" কথাটা শেষ হইল না, বুড়া শেষটা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিলেন, চাহিয়াই আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমি ভাবিলাম, তিনি হয়ত আমাকে দেখিয়াই লজ্জিত হইয়াছেন। আমি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিলাম; বৃদ্ধ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের ননীকে দেখিয়াছেন কি ?"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ননী, ননী কে ?" তিনি বলিলেন, "ও, ভুল হইয়াছে, মাপ করিবেন।" বৃদ্ধ ধীরে ধীরে জলা-পাহাড়ের উপরে উঠিতে লাগিলেন, কুয়াসা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। অল্পক্ষণ পরে পাহাড়ের উপর হইতে শব্দ হইল, "মেদ মামা—আয়—বাড়ী আয়।"

জনশূন্য ক্যালকাটা-রোড ছাড়িয়া উপরে উঠিলাম। জলাপাহাড় হইতে একজন পাহাড়ী সহিস একটা ঘোড়া লইয়া আসিতেছিল, তাহাকে বৃদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; সে বলিল যে, পথে সে কাহাকেও দেখে নাই। সহসা কুয়াসা কাটিয়া গেল, উজ্জ্বল সূর্য্যালোক প্রকাশ পাইল; উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, জলা-পাহাড়-রোডে কেহই নাই।

কি হইল ? স্বপ্ন দেখিলাম না কি ? মিশরদেশীয় সিগারেটের ধূম আর হিমালয়ের ঘন, তরল কুয়াসা মিশিয়া কি বৃদ্ধের মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছিল ? না। তাহাকে স্পষ্ট দেখিয়াছি,

তাহার সঙ্গে কথা কহিয়াছি ; সে ত প্রেত নহে, সে ত ছায়া নহে। বহ্রাওনের নবাব-নন্দিনীর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া শেষটা কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ? ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কি স্বপ্নটা দেখিলাম ? এইসকল কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখি, আপনার অজ্ঞাতসারে জলাপাহাড়-রোড বহিয়া উপরে উঠিতেছি। এমন সময়ে পিছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ হইল, আমি চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম যে, দশ-বার বৎসরের একটি বালক ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে। তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিলাম ; কিন্তু সে আমার নিকটে আসিয়া ঘোড়া থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি মেদ মামাকে—ছেঁড়া-পোষাক-পরা একটি বুড়া ভদ্রলোককে কুকুর সঙ্গে লইয়া এই পথে যাইতে দেখিয়াছেন কি ? তাহার প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমে কি উত্তর দিব, স্থির করিতে পারিলাম না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, বৃদ্ধকে ঠিক দেখিয়াছি, নিশ্চয় দেখিয়াছি ; বৃদ্ধ কবি-কল্পনার প্রতিধ্বনি নহে ; তাহা হইলে এই বালক কখনও তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিত না। তাহাকে বলিলাম, "দেখিয়াছি।" সে আমার বিলম্ব দেখিয়া অধীর হইতেছিল, উত্তর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোন্ পথে গিয়াছেন ?" বলিলাম, "এই পথে।" বালক ঘোড়া ছুটাইয়া জলা-পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল।

আকাশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আর একটু বেড়াইতে ইচ্ছা হইল। জলা-পাহাড়ের পথ ধরিয়াই উঠিতে লাগিলাম। সহরের বসতি ছাড়াইয়া আসিয়া, পথের ধারে একটি বড় অরোকেরিয়ার ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিলাম। এমন সময়ে কাহার স্পর্শে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম, সেই লোমবিহীন, গতযৌবন, অস্থি-চর্ম্মসার কুকুরটি লেজ নাড়িতে নাড়িতে আমার হস্তলেহন করিতেছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে বৃদ্ধ নাই। আমাকে উঠিতে দেখিয়া কুকুরটি অরোকেরিয়ার বনের ভিতর প্রবেশ করিল, কিন্তু আমি অগ্রসর হইতেছি না দেখিয়া ফিরিয়া আসিল। আমি চারিদিক ভাল করিয়া দেখিলাম, কোথাও বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলাম না। কুকুরটিকে বনের ভিতর হইতে দুই-তিন বার আসা-যাওয়া করিতে দেখিয়া বড়ই সন্দেহ হইল। অরোকেরিয়ার বন পাহাড়ের গা বহিয়া নামিয়া গিয়াছে। কুকুরটির সহিত নীচে নামিলাম, পাহাড়ের বন অন্ধকার, বন্ধুর, লতা, গুল্ম ও শুষ্ক পত্রে পরিপূর্ণ, তাহার উপর বৃষ্টি হইয়া সমস্ত পচিতে আরম্ভ হইয়াছে, পথ ভয়ানক পিচ্ছিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বৃষ্টিতে পাহাড়ের কতকটা ধসিয়া গিয়াছে, তাহার নীচে নূতন রাঙ্গা মাটির উপরে বৃদ্ধের শীর্ণ দেহখানি পড়িয়া রহিয়াছে। কুকুরটা এই সময়ে জোরে ডাকিতে আরম্ভ করিল,

আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল, কারণ, আমার কেবল মনে পড়িতেছিল—

"বন-ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।"

বহু চেষ্টা করিয়া কিছুতেই লক্ষ্মীছাড়া গানটাকে মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না। বহুকষ্টে নামিয়া বুড়াকে উপরে তুলিয়া আনিলাম, পোষাকটা কাদা-মাখা হইয়া গেল, নূতন দামী বর্ষাতিটা ছিঁড়িয়া গেল, নিজেই নিজের উপরে ভয়ানক চটিয়া উঠিলাম। স্থির করিলাম, আর কখনও বড্রাও নের নবাব-নন্দিনীর কথা ভাবিব না।

বৃদ্ধ আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে শোয়াইয়া রাখিয়া জলের চেষ্টায় বাহির হইলাম। পথের ধারে নর্দ্দামায় নূতন টুপিটা ডুবাইয়া কাদা-ভরা বৃষ্টির জল ধরিয়া আনিলাম। আবার বৃষ্টি আসিল। ফিরিয়া গিয়া দেখি, বৃদ্ধের জ্ঞান হইয়াছে, তিনি ক্ষীণস্বরে বলিতেছেন, "মেদ মামা—আয় বাবা—আয় বাড়ী আয়—আয় ফিরে আয়।" বৃদ্ধকে তুলিয়া আনিয়া পথের ধারে একটা বড় অরোকেরিয়ার গাছের তলে বসাইলাম এবং তাঁহাকে বর্ষাতি চাপা দিয়া নিজে ভিজিতে লাগিলাম। এই সময়ে আবার কে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়,

মেদ মামাকে—সেই ভদ্রলোকটিকে আর দেখিয়াছেন কি ?”

২

নামটি বেশ,—করবী চট্টোপাধ্যায়, হাতের লেখাটাও বেশ। চৌরাস্তার বেঞ্চির উপরে একখানি বই কুড়াইয়া পাইলাম, বই খানির ভিতর-বাহির সবই ভাল। নাম “আলো ও ছায়া” ভাল মরক্কো-চামড়া-দিয়া বাঁধান, তাহার উপরে সোণার জল দিয়া নাম লেখা। করবী কি পুরুষমানুষের নাম, না স্ত্রীলোকের নাম ? হায় হায়, যদি ভাল করিয়া সংস্কৃত পড়িতাম ? তাহা হইলে কি, আর এত ভাবিতে হয় ? মনে মনে বড়ই আপ্‌শোষ হইল। কেন নন্দ পণ্ডিতকে ফাঁকি দিয়াছিলাম ? উঁহু, ব্যাকরণ পড়িলেও ছাই হয়, নাম পড়িয়া সহজে স্ত্রী কি পুরুষ তাহা বুঝিবার জো-টি নাই। পুরুষের নাম দেখিলে একরকম মোটামুটি বলা যায় যে, ইহারা পুরুষ, কিন্তু স্ত্রীলোকের নাম এখন অনেক পুরুষে ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন ব্যারিষ্টার শান্তা, তার পুরা নামটি শান্তব্রত ভাদুড়ি ; কিন্তু সে নামসই করে, “শ্রীশান্তা ভাদুড়ি” আর দেশশুদ্ধ লোকে তাহাকে তাই বলিয়া ডাকে। সুতরাং—

করবী কি স্ত্রীলোকের নাম ? নামটী কিন্তু বেশ, কবিত্ব-

পূর্ণ, একেবারে হালফ্যাসানের। এই ভাবিতে ভাবিতে 'বেঞ্চ' ছাড়িয়া উঠিলাম, বইখানা অবশ্য হাতে ছিল, ছাড়ি নাই। ম্যালের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। কিছুদূরে একটা হাওয়া-ঘরের ভিতরে একটি মধ্যবয়স্কা মহিলা ও বালক বসিয়াছিল, সুতরাং আমার আর বসা হইল না। আমি হাওয়া-ঘরটা ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে কে পিছন হইতে ডাকিল, "মহাশয়, আমায় মাপ করিবেন, আপনি কি ম্যালে একখানি বই কুড়াইয়া পাইয়াছেন?" আমি বলিলাম, "হাঁ, কেন?" বলিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলাম, সে সেই বৃদ্ধের ভাগিনেয়, ঘোড়ায় চড়িয়া মেজ মামাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। সেও বলিয়া উঠিল, "ওঃ, আপনি?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাল তোমার মামা ঠিক বাড়ীতে পৌঁছিতে পারিয়ায়ছন ত? তিনি কেমন আছেন?" "ভাল আছেন, আপনার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করি নাই বলিয়া বাবা বড় বকিয়াছেন।"

এই সময়ে হাওয়া-ঘরের ভিতর হইতেই আহ্বান হইল "পন্নগ!" সে তাহা শুনিয়া বলিল, "মা ডাকিতেছেন, আপনি দাঁড়ান, আমি এখনই আসিতেছি, যেন চলিয়া যাইবেন না, তাহা হইলে মার খাইব।" বালক চলিয়া গেল, ২।৩ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "মা

আসিতেছেন।" মহিলাটি হাওয়া-ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি কাল দাদাকে বড় বাঁচিয়েছেন; আপনি না থাকিলে দাদাকে হয়ত আর পাওয়া যেত না। পন্নগ ছেলেমানুষ, আপনার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভুলে গিয়েছিল। উনি বল্‌ছিলেন যে, আপনার সন্ধানে বাহির হবেন।" পন্নগ অমনি বলিয়া উঠিল, "মা, তোমরা দাঁড়াও, আমি বাবাকে ডেকে আনি।" সে এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। ঘোড়াটা কোথায় ছিল, তাহা এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই।

পন্নগ চলিয়া গেলে, তাহার মাতা নানাকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলাম। বলিতে কি, আমি বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলাম। এই কি করবী? চৌরাস্তার বেঞ্চের উপর বইখানা পাইয়া মনে যে একটু স্ফূর্ত্তি আসিয়াছিল, তাহা ত উড়িয়া গেল। পন্নগের মাতার রংটি বাদামী, বয়স চল্লিশের ঊর্দ্ধ, দীর্ঘাকার, স্থূলাঙ্গী, মুখময় বসন্তের দাগ। তবে মুখখানি সদাই হাসি-হাসি, দেখিলেই বোধ হয় তিনি সদানন্দময়ী; কাপড়-চোপড়, পোষাক-আশাকের তেমন আড়ম্বর বা বাহুল্য নাই। গিন্নী-মানুষের মত চাল-চলন। তাহা হইলে কি

হয়, এই কি আমার কল্পনার করবী? মনে মনে শপথ করিলাম, আর কখনও কবিতা পড়িব না।

পন্নগের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আর কতদিন এখানে থাক্‌বেন?" আমি বলিলাম, "এখনও একমাস, নীচে বৃষ্টি আরম্ভ না হ'লে যাব না।"

"তবে আজ সন্ধ্যার সময়ে আমাদের বাড়ীতে আহার করবেন।"

একবার ভাবিলাম, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি; কিন্তু মন কিছুতেই লাগাম মানিল না—তখন সবই বেসুরা লাগিতেছে। বলিলাম, "ক্ষমা করিবেন, আজ আসতে পারব না, অন্য এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে।" কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

পন্নগের মাতা বলিলেন, "তবে কাল? একদিন আসিতেই হইবে, না আসিলে আমরা বড়ই দুঃখিত হইব।" কি করি? বলিলাম, "কা'ল আসব"। এমন সময়ে পন্নগ তাহার পিতাকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তিনি বেশ মানুষ, তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে আমরা সকলে চৌরাস্তায় আসিলাম। চৌরাস্তায় আসিয়া তিনি পন্নগের মাতাকে কহিলেন "করু? মেজদাদার রক্ষাকর্ত্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ ত?" তিনি বলিলেন "হাঁ।"

"কবে?"

"কা'ল সন্ধ্যার সময়।"

"মহাশয় কা'ল নিশ্চয় আসবেন?"

আমি বলিলাম, "অবশ্য আসব।" বলিয়াই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। এতক্ষণ কিছু কিছু আশা ছিল; কিন্তু তিনি যখন মহিলাটীকে 'কক্ক' বলিয়া ডাকিলেন, তখন আমার আশালতার মূলে কুঠারাঘাত হইল। ইনিই করবী? হা অদৃষ্ট!

একটু পরে শুনিলাম, পন্নগের পিতা বলিতেছেন, "বড় আশ্চর্য্য ঘটনা, ঠিক ছোট গল্পের মত। কাল আপনি একটু সকাল-সকাল আসিবেন, সন্ধ্যার সময়ে বলিতে আরম্ভ করিব। আর আমার মেয়েটি আপনাকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক হয়েছে। আপনি তার মেজমামাকে বাঁচিয়েছেন শুনে সে নাম না-জানার অপরাধে তিনবার পন্নগের সঙ্গে ঝগড়া করেছে আর অন্ততঃ বিশবার আপনার চেহারার আর ঘটনার বিবরণ শুনেছে, তবুও তার আশা মেটে নি।"

ভাবিলাম, 'ছোট গল্পের মত? হয়ত রোমান্স?' না আর কখনও এমন কাজ করা হইবে না, ম্যালে বই কুড়াইয়া পাইয়া মনে মনে যে কল্পনার স্বর্গ-রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সত্যের কঠোর করাঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর কল্পনায় কাজ নাই! পন্নগরের ভগিনীটি হয়ত নিতান্ত শিশু, এবং

মেজমামা হয়ত অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন, খাইতে দিতে হইবে বলিয়া প্রথমে হয়ত কুকুর পুষিতেন না, পরে এক সলাঙ্গুল চতুষ্পদের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সন্ধ্যা হইল, চৌপায় বাতি জ্বলিয়া উঠিল, লোক বাড়ী ফিরিতে আরম্ভ করিল, আমিও ফিরিলাম। 'স্যানিটারিয়মে' আসিয়া দেখি, বাড়ী হইতে একখানি চিঠি আসিয়াছে। মা লিখিয়াছেন—

"চিরজীবেষু,

"বাবা, তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। নিজে তোমার জন্য একটি পরম সুন্দরী পাত্রী দেখিয়া রাখিয়াছি। তাহারা জমিদার, বড়লোক, বেশ দিবে-থুবে। তুমি আমার কথা রাখ, আর পাগলামো করিয়া বেড়াইওনা। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, তোমার বিবাহ দিয়া একটি বউ আনিয়া চিরজন্মের সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ করিব। বাবা, আমার মুখ রাখিও। পত্রপাঠ চলিয়া আসিও। কোনও ওজর বা আপত্তি করিও না!—"

আর পড়া অসম্ভব। দুইটি কারণ আছে; প্রথম কারণ 'স্যানিটারিয়মে' ঘণ্টা দিয়াছে এবং দ্বিতীয় কারণ, মায়ের আবদার অসম্ভব! আমি কখনই লাল-চেলি-মোড়া নোলকপরা একটি জড়পিণ্ডকে বিবাহ করিতে পারিব না। কি অন্যায়? এদেশের মা-বাপেই দেশের সর্ব্বনাশ করে! যাহা আমি

সহিতে পারি না, আমাকে কিনা চিরদিন তাহাই সহিতে হইবে, বিশেষ যখন হিন্দুর বিবাহে 'ডাইভোর্স' নাই। সেকেণ্ড-বেল হয়ে গেল যে!

৩

"আমার স্ত্রীর একটি বিশেষ দোষ আছে, তিনি কুকুর দেখিলে ভয়ানক চটিয়া যান; অথচ এই বুড়া কুকুরটি দেখিতেছেন, ইহাকে তিনি বড়ই ভালবাসেন।"

"এটি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগিনীর স্মৃতি-চিহ্ন। কুকুরটাও অনেক দিন বাঁচিয়া আছে, ইহার বয়স প্রায় বিশ বৎসর হইল। সাধারণতঃ কুকুর দশ-বার বৎসরের বেশী বাঁচে না; তবে কোন কোন জাতের কুকুর কুড়ি বৎসর অবধি বাঁচিয়া থাকে।"

"প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার শ্বশুর নদীয়া-জেলায় রঘুনাথপুরের 'সব-রেজিষ্ট্রার' ছিলেন। আমার বড় শ্যালী তখন পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহার তখন একটিমাত্র পুত্র। তাহার বয়স তখন তিন বৎসর। অতি অল্প বয়সে আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল; সেইজন্য ইহারা মধ্যম ভ্রাতাকে মেজদাদা বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। তখন এক পুত্র ও দুই কন্যা ব্যতীত আমার শ্বশুর-মহাশয়ের

অন্ত কোন সন্তান ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে আমার স্ত্রীই সর্ব্বকনিষ্ঠ।"

"তখন নদীয়া-জেলায় খুব নীলের আবাদ হইত। অনেক বড় বড় কুঠিয়াল-সাহেবের সহিত আমার শ্বশুরের পরিচয় ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন তাঁহাকে দুইটি খুব ভাল কুকুরের ছানা উপহার দিয়াছিলেন। আমার শ্বশুর ব্যতীতও তাঁহার বংশের কেহ কুকুর দেখিতে পারিত না। আমার শাশুড়ী ত কুকুর স্পর্শ করিলে স্নান করিতেন। ইনি, ইঁহার মেজদাদা এবং ইঁহার দিদিও তদ্রূপ। কেবল আমার শ্বশুর ছানা দুইটিকে বড় ভালবাসিতেন। আমার বড় শ্যালীর ছেলেটিও সর্ব্বদা আমার শ্বশুরের নিকটে থাকিত বলিয়া তাঁহাদিগের বড় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

"চিনি, চিনি, এইদিকে আয়।"

এককোণ হইতে সেই বৃদ্ধ কঙ্কালসার কুকুরটি লেজ নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া আসিল। অতুলবাবুর গৃহে আহারান্তে আমরা সকলে বসিয়া আছি, অতুলবাবু সেই গল্পটি বলিতেছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "এই দেখুন, এত অধিক বয়সেও জায়গায়, জায়গায় ইহার গায়ে কত বড় বড় লোম রহিয়াছে। এককালে চিনি দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিল, কেমন চিনি? তখন ইহার গা-ভরা কোঁকড়া কালো-

চুল ছিল, আবার মাঝে মাঝে শাদা দাগ থাকায় সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিয়াছিল, চিনির কাণদুটি ঘোর কালো ছিল, কেমন-গো ?"

পন্নগের মাতা মাথা নাড়িলেন, পন্নগ বলিল, "আমাদের বাড়ীতে চিনির বড় 'ফটো' আছে, তাহাতে উহার কাণের চুল কালোই আছে।" অতুলবাবু বলিতে লাগিলেন, "আমার বড় শ্যালীর ছেলের নাম ছিল ননী। দেখিতে তার মাতার মত সুন্দর ছিল, তাহার সুন্দর নীল চক্ষু দু'টি, আর তাহার কোঁকড়া চুলের রাশি চিরদিন আমার মনে থাকিবে। ননী, চিনির ভাই নিনিকে বড় ভালবাসিত। চিনি আমার শ্বশুরের নিকটে থাকিত, নিনি দেখিতে ঠিক চিনির মতই ছিল।"

অতুলবাবুর মুখের চুরুটটা নিবিয়া গিয়াছিল, তিনি তাহা ধরাইয়া একটান দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "করু, করবী কোথায় ?" পন্নগের মাতা বলিলেন, "তুমি ননীর গল্প বলিবে বলিয়া সে আগে থাকিতে শুইয়া পড়িয়াছে।" অতুলবাবু আমাকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন, "করবী আমার প্রথম সন্তান। তাহার মন বড়ই কোমল, সে কখনই ননীর ও নিনির কাহিনী স্থির হইয়া শুনিতে পারে না।"

আমি ভাবিলাম, "করবী তবে একজন আছে।—

কিন্তু 'রোমান্স' কিছুতেই না, ঠেকিয়া শিখিয়াছি—মাতাকে দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছি, কন্যা-দর্শনে স্পৃহা নাই। শুনিলাম অতুলবাবু বলিতেছেন, "শুনুন না মহাশয়! এ কাহিনীর প্রথমটা নীরস বটে, কিন্তু শেষটা বড়ই করুণ-রসাত্মক। ননীর বয়স তখন তিন বৎসর এবং নিনির বয়স তিন-চারিমাস, এই সময়ে তাহাদিগের প্রথম আলাপ হয়। নিনি বড় গম্ভীর-প্রকৃতির কুকুর ছিল। কে তাহাকে ভালবাসে, এবং কে তাহাকে দেখিতে পারেনা, তাহা সে বুঝিত। সে প্রাণান্তেও আমার স্ত্রীর নিকটে কিংবা আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর নিকটে অথবা আমার সম্বন্ধীর নিকটে যাইত না। কখনও কখনও আমার শ্বশুর-মহাশয় ডাকিলে, তাঁহার নিকটে যাইত। সে ননীর নিকট থাকিত, ননীর সঙ্গে খাইত এবং ননীর কাছেই শুইয়া থাকিত। আমার শ্বশুর-মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, ননীর সহিত নিনিকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। রাত্রিতে ননী অবশ্য তাহার মাতার নিকট শয়ন করিত, নিনি তখন তাহাদিগের পায়ের তলায় শুইয়া থাকিত।

"তখন আমার শ্বশুর-গৃহের দিনগুলি এমন সুন্দর কাটিতেছিল যে, কেহই তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, এত শীঘ্র তাহা শ্মশানে পরিণত হইবে। আমার শ্বশুর-মহাশয় শিক্ষিত

ছিলেন, ধর্ম্মের নামে তাঁহার নিকট মেকি চলিত না। গুরু-পুরোহিতের অত্যাচার তাঁহার গৃহিণীই সহ্য করিতেন। আমার শ্বশুর-বংশের কুলগুরু আসিয়াই সর্ব্বনাশ করিয়া গেলেন।

"গুরু আসিয়াছেন, অন্দর মহলে মহাগোলযোগ উপস্থিত। কেহ পাদপদ্ম পূজা করিবে, কেহ ব্রতগ্রহণ করিবে ইত্যাদি। গুরুঠাকুর আমার শ্বশুর-মহাশয়কে দীক্ষা দিতে পারেন নাই বলিয়া বড়ই দুঃখিত ছিলেন এবং তাঁহাকে যাবনিক আচার পরিত্যাগ করাইয়া, দীক্ষা দিয়া তাঁহার কলুষিত দেহখানা মন্ত্রশুদ্ধ করিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র ছিলেন।

"ঠাকুর-মহাশয় আসিলে চিনি ও নিনি বড়ই বিপদে পড়িল। তাহাদিগকে চিরাভ্যস্ত বাস-গৃহ ত্যাগ করিতে হইল। শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাহাদিগকে আস্তাবলে নির্ব্বাসিত করিলেন। সেই সময়ে ননী বড় বিপদে পড়িল। সে তখন আর নিনিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। খাইবার সময়ে, শুইবার সময়ে ও বেড়াইবার সময়ে নিনিকে না পাইয়া সে বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার সহস্র অনুরোধ ও অনুনয় সত্ত্বেও কেহই চিনিকে ও নিনিকে গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আসিতে দিত না। ননী বাধ্য হইয়া সমস্ত দিনটি আস্তাবলে বসিয়া থাকিত এবং সন্ধ্যার

সময়ে দাসীর কোলে কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকটে ফিরিয়া আসিত। তাহার কোনও অপরাধ ছিল না; কারণ আমার শ্বশুর-গৃহে বা নিকটে সে সময়ে তাহার সমবয়স্ক বালক বালিকা ছিল না। ননী এই মূকবন্ধুটিকে পাইয়া সমস্তটি দিন তাহার সহিত খেলা করিত। নিনি তাহার সহিত লাঠি মুখে করিয়া বেড়াইতে যাইত, বল ছুড়িয়া দিলে ছুটিয়া গিয়া লইয়া আসিত, জলে লাঠি ফেলিয়া দিলে সাঁতার দিয়া ধরিয়া আনিত, আবার কখনও কখনও কিছু খেলিবার সামগ্রী না পাইলে ননীর কোলের কাছে চিৎ হইয়া শুইয়া আদর করিয়া হাত কামড়াইত।

"গুরুদেব দীক্ষা-গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিলে, আমার শ্বশুর-মহাশয় মফঃস্বলে যাইবার অছিলা করিয়া শিকারে বাহির হইয়া গেলেন। ঠাকুর-মহাশয়ও অভীষ্ট সিদ্ধির কোনও উপায় না দেখিয়া গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইলেন। তিনি যেদিন ফিরিবেন, সেইদিন আমার শ্বশুর-গৃহে আগুন লাগিল।

"দিনের বেলায় ঠাকুর-মহাশয় যখন আহারে বসিয়াছেন, ননী তখন আস্তাবলে চিনি ও নিনির সহিত খেলা করিতেছিল। খেলা করিতে করিতে নিনি হঠাৎ ছাড়া পাইয়া পলাইল। ননী তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিল; কিন্তু সে

অত দৌড়াইতে পারিবে কেন? নিনি পলায় নাই, সে প্রভু-গৃহের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। সে যে ঘরে ননীর সহিত খেলা করিত, সেই ঘরে গুরুদেব আহারে বসিয়াছিলেন। নিনি ছুটিতে ছুটিতে সেই ঘরটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তখন ঠাকুর-মহাশয়ের আহার প্রায় শেষ হইয়াছে। তিনি এই অপবিত্র সারমেয় শিশুটিকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অন্ন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সকলে "হাঁ হাঁ" করিয়া উঠিল। নিনি পলাইল না। সে নিতান্ত অপরাধীটির মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া সকলের রাগ আরও বাড়িয়া গেল। গুরুদেব সারমেয়-পালন চণ্ডালের কার্য্য, ব্রাহ্মণের অনুচিত, এই কথা বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় কেহই কর্ণপাত করিল না। আমার শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে আপদটাকে মেরে ফেল্, মেরে ফেল্। ঠাকুরমহাশয়ের খাওয়া নষ্ট করে দিলে!'

নিকটে একখানা বড় ইষ্টক পড়িয়াছিল, মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া মেজদাদা সেখানা নিনির দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন, নিনি সে আঘাতে পড়িয়া গেল। এই সময়ে ননী ছুটিতে ছুটিতে সেই-খানে আসিয়া পৌছিল, এবং তাহার মাতুলের হস্তে ইষ্টক দেখিয়া আধ আধ কথায় বলিয়া উঠিল, 'মেদমামা, মেয়োনা, ময়ে যাবে! মেদমামা, ময়ে যাবে!" সে হাঁপাইতেছিল, তাহার

মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। ইষ্টক, নিনির ক্ষুদ্র মস্তকটি চূর্ণ করিয়া দিল, ননী "নিনি গো" বলিয়া খেলার সাথীর দেহের উপর লুটাইয়া পড়িল। নিনি তখনও মরে নাই, একবার ক্ষীণভাবে লেজ নাড়িল, ননীর হাতখানি চাটিল, তাহার মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষুদ্র নয়নদুটি হীনপ্রভ হইল।

৫

কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই রাত্রিতেই ননীর জ্বর হইল। পরদিন প্রাতে শ্বশুর-মহাশয় যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন গুরুদেব চলিয়া গিয়াছেন, ননী তখন বিকারে অচেতন। সে কেবল বলিতেছে "মেদমামা, মেয়োনা—মরে যাবে।" তাহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। দুইদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় ননী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "নিনি, নিনি, আয় আয়।" তাহার মাতা ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বাবা, কোথায় নিনি? ওকথা বলিতে নাই, তুমি ঘুমাও।" ননী বলিল, "না, মা, নিনি। মেদমামা মাবে, নিনি আবেনা।" চোখের জল মুছিতে মুছিতে মাতা বলিলেন, "ছি বাবা, ঘুমাও।" ননী পুনরায় বলিল, "মা, ঐ নিনি।"

"শেষ রাত্রিতে ননীর জ্বর ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। বাড়ীর

সকলে তাহার শয্যা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ননী মুদিতনয়নে বলিল, "মেদমামা মাবে, নিনি আবেনা।" তাহার মাতা ছেলের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িলেন, ননী আবার বলিল, "মেদমামা দুষ্টু মাবে, মা নিনি—ষাই।" তাহার রোগক্লিষ্ট মুখখানিতে একটি সুন্দর অথচ ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল, ননী তাহার সখার সন্ধানে চলিয়া গেল।

"ননীর মাতা তাহার জন্য পাগল হইলেন, শ্বশুর-মহাশয় তাঁহাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। সন্তানসম্ভবা জননী পুত্রশোকে পীড়িতা হইয়া পড়িলেন, একমাসের মধ্যে ননীর মাতাও ননীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। আমার শ্বশুর-মহাশয় ছুটি লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। সেই অবধি মেজ-দাদা কেমন হইয়া গিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, নিনি মরে নাই, ননী তাহাকে খুঁজিতে গিয়াছে এবং তিনি নিনিকে মারিয়াছেন বলিয়া সে কোথায় অভিমান করিয়া বসিয়া আছে। তিনি সকল সময়ে এমন থাকেন না, সময়ে বেশ ভাল থাকেন, আবার যখন ঝোঁকটা আসে, তখন ননীকে খুঁজিয়া বেড়ান। শ্বশুর-মহাশয় ও শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী তাহার পরে একবৎসরও বাঁচেন নাই। মেজদা ও চিনি সেই অবধি আমাদের এখানে আছেন। গুরু-ঠাকুরটি এখনও যমালয়ে যান নাই, তিনি বলিয়া বেড়ান যে, অনাচারে অনাচারে বংশটা উচ্ছন্ন গেল।"

পন্নগের মাতা এতক্ষণ আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিয়াছিলেন, তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "ওর ঐ সকল কথা, গুরু-ঠাকুরের আর দোষ কি?" অতুলবাবু বলিলেন, "না, দোষ আমার।"

অনেক রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া উঠিলাম। অতুলবাবু ও তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আর একদিন আসিবেন"। আসিব স্বীকার করিয়া দ্রুতপদে স্যানিটারিয়মে ফিরিয়া আসিলাম। পথে কেবল মনে হইতে লাগিল, "কি কুক্ষণেই বদ্রাওনের নবাব-নন্দিনীর প্রতীক্ষায় জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে বসিয়াছিলাম! আর কখনও রবিঠাকুরের গল্প পড়ব না।

ঘরে আসিয়া দেখি অনেক পত্র আসিয়াছে, মা লিখিয়াছেন—

"বাবা পত্রপাঠ রওনা হইবে। ১৪ই আষাঢ় বিবাহ। তোমার শ্বশুর-মহাশয় একা মানুষ, তাঁহার একটীমাত্র পুত্র। তিনি লিখিয়াছেন যে, আমাদের দুইপক্ষেরই আয়োজন করিতে হইবে। নূতন বৌমার ছবি পাঠাইলাম; দেখিয়া ফেরৎও দিও।"

দেৎ—মাটা নেহাৎ সেকেলে। ছবি পাঠাইয়াছে লিখিয়াছে—কোথায় ছবি, তার ঠিক নাই। যদি-বা বিবাহ করিতাম, আর কখনই করিব না।

বাবা লিখিয়াছেন :—

"ললিত, ১৪ই আষাঢ় তোমার বিবাহ। তোমার গর্ভ-ধারিণী, তোমার মাতামহী, নরেন এবং সুধা পাত্রী পছন্দ করিয়াছে। কন্যাপক্ষের সমস্ত আয়োজন আমাদিকে করিতে হইবে। বৌমার অলঙ্কার-খরিদের জন্য বৈবাহিক-মহাশয় টাকা পাঠাইয়াছেন। অদ্য কলিকাতায় তোমার নামে দশহাজার টাকার 'হাফ নোট' পাঠাইলাম, তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। খবরদার, হ্যামিল্টনের বাড়ী পয়সা নষ্ট করিও না, পূরণচাঁদের দোকান হইতে কিনিও।"

নরেন আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী। সে লিখিয়াছে :—

"তোর বিবাহের সমস্ত ঠিক। সুধা আর আমি পাত্রী দেখিয়া আসিয়াছি। তোর জন্য একখানা ছবি পাঠাইলাম। ১৪ই আষাঢ় বিবাহ। পত্রপাঠ নামিয়া আসিবি, অনেক কাজ আছে।"

যাক্, নরেন ছবিখানা পাঠাইতে ভোলে নাই। নাঃ, নোলকপরা পেনপেনে মেয়ে নয়। রং 'ফটোগ্রাফ' দেখিয়া বুঝিবার যো নাই। চেহারা মন্দ নয়। এখন উপায়? বাবা যখন লিখিয়াছেন, তখন ত আর উপায় নাই, নামিতেই হইবে। আমার বাবাটির সঙ্গে ট্যাঁ-ফুঁ করিবার উপায় নাই।

সকালে উঠিয়াই অতুলবাবুদের বাড়ী ছুটিতে হইল,

রাত্রিতে 'ওয়াটার প্রুফ' ফেলিয়া গিয়াছি। অন্ধকারে বাড়ীটা ভাল দেখিতে পাই নাই; সামনে একটি বেশ সুন্দর ছোট বাগান। বর্ষা পড়িয়াছে, গোলাপ-গাছগুলা শুকাইয়া গিয়াছে, অসংখ্য নানাবর্ণের ডালিয়া ফুটিয়াছে। বাগানে একখানি বেঞ্চের উপর কে বসিয়া আছে। সুরসুন্দরী, অপ্সরী, না কিন্নরী? পাথরের মূর্ত্তির মত বাগানের দুয়ারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সময়ে দূরে শুনিতে পাইলাম কে বলিতেছে, "মেদমামা—আয় বাবা—আয় ফিরে আয়।" সর্ব্বনাশ! স্বপ্ন বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়—আবার সেই! হে স্বপ্নের ঠাকুর, তুমি এক মুহূর্ত্ত থাক। আমি প্রাণ ভরিয়া একবার দেখিয়া লই।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল—আমাকে দেখিতে পাইয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। পন্নগের মেজমামা বাহির হইয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখিলাম, সমস্ত জিনিষ-পত্র বাঁধা। অতুলবাবু 'লগেজে'র 'লেবেল' লাগাইতেছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমরা আজই কলিকাতায় যাইব, ১৪ই আষাঢ় করবীর বিবাহ।" 'আলো ও ছায়া' খানা সেদিন ফিরাইয়া দিই নাই। সেখানা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম, "বইখানা সেদিন ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই।"

"আপনিও যাইবেন ?" কেন ? "তাহাতে আর কি ?"

"বিশেষ প্রয়োজন আছে। বহরমপুরের গিরিজানাথ রায়-মহাশয়ের পুত্রের সহিত করবীর বিবাহ। আপনি কি তাঁহাদিগকে চেনেন ?"

কি সর্ব্বনাশ ! তিনিই যে আমার পিতাঠাকুর ! মুখের সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া ফেলিলাম।

মায়া

তিন বৎসর ভুগিয়া কোলের ছেলেটি যখন গেল, তখন আমি পাগলের মত হইলাম। সেইজন্য তিনি এদেশের রেলের চাকরী ছাড়িয়া দার্জ্জিলিঙের রেলে চাকরী লইলেন, জীবনে প্রথম দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিলাম। মেঘের রাজ্যে গিয়া প্রথম প্রথম বেশ ভালই ছিলাম। দেশটা নূতন ধরণের—ঘর-বাড়ী, লোকজন, গাছপালা সমস্তই নূতন ধরণের, এমন কি রেলগাড়ী পর্য্যন্ত নূতন। দুঃখ শোক ভুলিয়া নূতন দেশে মন্দ ছিলাম না। প্রথমে তিনি দার্জ্জিলিঙে ছিলেন, সেখানে অনেক সঙ্গী পাইয়াছিলাম, সময় যে কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত তাহা জানিতাম না।

কিছুদিন পরে তিনি যখন টুঙ্গে বদলি হইয়া আসিলেন, তখন আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। দার্জ্জিলিঙ ষ্টেশনে সাত আটটি বাঙ্গালী চাকরী করিতেন, তাঁহাদের সকলেরই বাসা নিকটে, সহরেও অনেক বাঙ্গালী পরিবারের বাস, অনেকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, কোন কষ্ট হইত না। টুঙ্গ ষ্টেশনে কেবল আমরাই ছিলাম, আর কেহ ছিল না। জন দুই

তিন পাহাড়ী সিগন্যালম্যান আর কুলি ছিল, তাহারা পরিবার লইয়া নীচে থাকিত। আমি সারাদিন একা বসিয়া থাকিতাম, খোকা ব্যতীত আর কথা কহিবার লোক ছিল না। তিনি ষ্টেশনে একা, সমস্ত কাজ এক জন লোককে করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার একদণ্ড অবসর ছিল না। সারাটি দিনের মধ্যে একবার তিনি আহার করিতে আসিতেন, সেও কেবল মিনিট পাঁচেকের জন্য। সুখের মধ্যে এ লাইনে রাত্রিতে গাড়ী চলে না, সন্ধ্যার সময়ে শিলিগুড়ির শেষ গাড়ীখানি ছাড়িয়া গেলে তিনি বাসায় ফিরিতেন, তখন আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম।

টুঙে প্রথম প্রথম কয়দিন যে যন্ত্রণায় কাটাইয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করা যায় না। যাঁহারা নির্ব্বাসনের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। চারিদিকে পাহাড়, যে দিকে দৃষ্টি যায় সেই দিকেই পাহাড়, শুষ্ক অচঞ্চল ভীষণদর্শন পর্ব্বত, কেবল উপরে নীল আকাশ আর সাদা মেঘ। যখন বাতাস বহিত, তখন চারিদিক হইতে শব্দ উঠিত, মনে হইত যে চারিদিকে গোলমাল হইতেছে, কিন্তু যখন চঞ্চল পবনের গতিও রহিত হইত, তখন মনে হইত যে বুকে অসহ্য ভার, নির্জ্জন কারাগারে বদ্ধ আছি, চারিদিকে পর্ব্বতগুলা তাহার প্রাচীর, আর আমি একা। সম্মুখে হিমালয়ের

উচ্চ প্রাচীর আর পশ্চাতে গভীর গর্ত্ত, মাঝে মাঝে ভয় হইত যে হয়ত কোনদিন পিছলাইয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যাইব। দার্জ্জিলিঙ বা শিলিগুড়ি হইতে যখন গাড়ী আসিত, তখন জানালার কাছে মুখ লাগাইয়া বসিয়া থাকিতাম, গাড়ী ছাড়িয়া গেলেও অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিতাম। রোজই একটি না একটি বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ দেখিতে পাইতাম, তখন মনে হইত যে একবার ছুটিয়া গিয়া দুটা বাঙ্গালা কথা কহিয়া আসি।

দার্জ্জিলিঙের পথে অনেক পাহাড়ী চলে, এখানে মানুষই দেখিতে পাওয়া যায় না। কদাচ কখনও দুই একজন পাহাড়ী পথে দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেশনের নীচে দুইখানি পাহাড়ী গ্রাম আছে, তাহাদের নামগুলি বেশ, 'মহারাণী' আর 'গৌরী-গঙ্গা', কিন্তু গ্রামের লোক বড় একটা রাস্তায় উঠে না। কেবল একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোককে মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। সে যখন আসে তখন অনেকক্ষণ ধরিয়া ষ্টেশনের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহার পরে ধীরে ধীরে নামিয়া যায়। দার্জ্জিলিঙে থাকিয়া দুই একটা পাহাড়ী কথা শিখিয়াছিলাম। এক দিন মনে হইল উহাকে ডাকাইয়া দু'টা কথা কই। নানিকে ডাকিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল যে ও গৌরীগঙ্গার যোগিয়া। তাহাকে ডাকিতে বলিলাম,

নানি ডাকিতে গেল, এমন সময় পিছনের দুয়ারে দাঁড়াইয়া পরিষ্কার বাঙ্গালায় কে জিজ্ঞাসা করিল, "মা তুমি আমায় ডেকেছ ?" ফিরিয়া দেখি সে গৌরীগঙ্গার যোগিনী।

অনেকদিন একা থাকিয়া শরীর বড়ই খারাপ হইয়াছিল, তখন যদি আমার হাতে পাণের বাটা থাকিত তাহা হইলে দেবীচৌধুরাণীর আবির্ভাবে সাগর বৌয়ের পরিচারিকার মত আমার হাত হইতে তাহা ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া যাইত। সে আমার ভাব দেখিয়া বলিল, "মা আমায় ডেকেছ কেন ? আমার নাম মায়া, যোগিয়া নয়।" তখন আমার কথা ফুটিল, আমি তাহাকে কাছে আসিয়া বসিতে বলিলাম।

সে পাহাড়ী বটে, কিন্তু তাহার দেহে মলার চিহ্ন নাই, মুখ চোখ বড় সুন্দর, বাঙ্গালীর মতই। তাহার বর্ণটি বড় সুন্দর, অনেক পাহাড়ী মেয়ে দেখিয়াছি, কিন্তু এত সুন্দর কখনও দেখি নাই। তখন তাহার প্রথম যৌবন কাটিয়া গিয়াছে, গাল দুইটি এখনও ফুল্ল গোলাপের মত, বর্ণ শুভ্র, ঈষৎ পীত অথচ রক্তিমাভ। পাহাড়ী পোষাকে তাহাকে মোটেই মানাইতেছিল না, আমার মনে হইতেছিল যে, একটি সুন্দরী বাঙ্গালীর মেয়েকে পাহাড়ী পোষাক পরান হইয়াছে।

অনেকদিন পরে বাঙ্গালা কথা কহিয়া বাঁচিলাম। সে বড় সুন্দর বাঙ্গালা কথা কয়, তাহাতে কোন বিদেশী টান নাই।

জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, সে অনেক বাঙ্গালীর বাড়ী চাকরি করিয়াছে, তাহাদের নিকট বাঙ্গালা শিখিয়াছে। গৌরীগঙ্গায় তাহার বাড়ী, পূর্ব্বে যিনি ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে তাহার আলাপ ছিল। তাঁহারা তাহাকে বড় ভালবাসিতেন, সেইজন্য যখন তাহার বড় মন কেমন করে, তখন আসিয়া ষ্টেশনটি একবার দেখিয়া যায়।

রাত্রিতে মায়া চলিয়া গেল। আমি তাহাকে রোজ আসিতে বলিয়া দিলাম। সেই অবধি সে রোজ সকাল বেলায় আসিত এবং সন্ধ্যায় তিনি গৃহে ফিরিলে চলিয়া যাইত। তাহার সংসারে কেহই নাই, পিতা মাতা বহুপূর্ব্বে স্বর্গবাসী হইয়াছেন, দুইটি ভগিনী বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে, তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্বামী বহুদিন নিরুদ্দেশ। আমি ভাবিতাম এমন স্ত্রী ফেলিয়া তাহার স্বামী কি জন্য নিরুদ্দেশ হইল, কিন্তু ভাবিয়া কোন সদুত্তর মিলিত না।

সেবারে পাহাড়ে বড় বেশী বৃষ্টি হইতেছিল। কাপড় শুকায় না, তাঁহার জুতাগুলা সব ভিজিয়া গিয়াছে, খোকার সর্দ্দি হইয়াছে, খুকীর জ্বর। বিকাল বেলায় আগুন জ্বালিয়া তাঁহার জুতা শুকাইতেছি, এমন সময় দার্জ্জিলিঙ হইতে ডাক-গাড়ী আসিল। বড় বর্ষা নামিয়াছে। পাহাড় হইতে সকল লোক নাবিয়া যাইতেছে। রোজ একখানির স্থানে তিনখানি

ডাকগাড়ী যায়। প্রথম গাড়ীখানি সবে ষ্টেশনের সন্মুখে আসিয়া লাগিয়াছে, এমন সময়ে মায়া ছুটিয়া আসিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে মায়া ?"

সে সময়টা আমার বেশ মনে আছে। বৃষ্টি একটু থামিয়াছে, মায়া খুকীকে কোলে করিয়া গাড়ী দেখাইতে লইয়া গিয়াছে। রাস্তাটি সাদা ধব ধব করিতেছে, উপরে রৌদ্র উঠিয়াছে, পাহাড়ের মাথায় ভিজা গাছগুলি পর্য্যন্ত রৌদ্রে সোণার বরণ ধরিয়াছে। ষ্টেশনের বাগানে লাল গোলাপগাছগুলাতে তখনও দশ পনেরটা গোলাপ ফুটিয়াছে, নীচে আর একখানা বড় মেঘ জমিতেছে, শীঘ্রই উপরে আসিবে। মায়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "তিনি আমার স্বামী।" আমি তাড়াতাড়ি একখানা জুতা আগুনের কাছে দিয়া জানালার নিকট গেলাম। মায়া যে গাড়ী দেখাইয়াছিল, সেখানি একখানি সেলুন গাড়ী। তাহাতে একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতেছেন, ভিতরে একটি প্রৌঢ়া মোজা বুনিতেছে, আরও দুইটি মেয়ে বসিয়া আছে। এমন সময়ে ঘণ্টা বাজিল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার স্বামী কে মায়া ?" মায়া বলিল, "উনিই আমার স্বামী।"

আমি বলিলাম "কি বলিলে ?"

তখন সে বলিল, "তিনটি ঝরণার ধারা যেখানে একত্র হইয়াছে, তাহারই পাশে গৌরীগঙ্গা গ্রাম। উপরে অভ্রভেদী হিমালয়, নিম্নে হিমালয়, চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় অরণ্যমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী। ঝরণার কূলে কূলে শস্যক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ, ইহাই গৌরীগঙ্গা গ্রাম।

গৌরীগঙ্গায় আমার জন্ম, গৌরীগঙ্গার শুভ্রজলরাশি যেখান দিয়া নৃত্য করিতে করিতে উপল-বহুল পথে ত্রিস্রোতায় আত্ম-সমর্পণ করিতে যায়, সেইখানে আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কাটিয়াছে। সারাটি দিন আমি গৌরীগঙ্গার কূলে কূলে বেড়াইতাম, নূতন লোক আমাকে বনদেবী মনে করিয়া দূর হইতে প্রণাম করিত।

মা, রূপই আমার কাল, এই পোড়া রূপের জন্য আজন্ম জ্বলিয়া মরিতেছি, ইহার জন্যই আমার ইহজন্মের সুখ, আশা, ভরসা, অতীত, ভবিষ্যৎ, সমস্ত ভস্ম হইয়া গিয়াছে। আমি পাহাড়ী ভূমিয়ার কন্যা, আমার কিসের দুঃখ ? আমাদের দেশে স্ত্রীজাতি স্বাধীন, স্বচ্ছন্দে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, সমাজের শাসন কঠোর নহে, কিন্তু এই রূপের জন্য আমি আজ অন্যরূপ হইয়া গিয়াছি। রূপও দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল এই ছার দেহখানা কবে ভস্ম হইবে তাহাই ভাবি।

আমার পিতা অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, বাল্যে আমাদের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ ছিল না। আমি ও আমার দুইটি ভাই বড় সুখেই শৈশব কাটাইয়াছি। আমার জন্য যে সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কেবল আমিই দুঃসহ দুঃখের ভার বহিবার জন্য বাঁচিয়া আছি। আমি সারাদিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে গৌরীগঙ্গার আঁকা বাঁকা পার্শ্বে পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াই, কিন্তু সন্ধ্যা হইলে গ্রামে ফিরিয়া যাই। আমার পিতৃগৃহের ভিত্তির উপর একখানি কুটীর বাঁধিয়াছি, আমি রাত্রিগুলি সেইস্থানেই অতিবাহিত করি।

মা, এখন আমি যোগিয়া, গৈরিক আমার বসন, এক সন্ধ্যাও অন্ন জুটে না, কিন্তু আমি ভিখারী নহি। এখনও আমি গৌরীগঙ্গা ও মহারাণীর জমিদার। যেদিন চিতার কোমল শয্যায় এ দগ্ধ হৃদয় অশান্ত অগ্নিশিখার তীব্র তপ্ত আলিঙ্গনে শান্ত হইবে, সেইদিন জানিবে আমার অর্থ কোথায় যায়। সে কাহার অর্থ? এ কাহার সম্পত্তি? আমি কে? বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপারে আমার যে ভাই শান্তির অন্বেষণে গিয়াছে, যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া যে অসীম শান্তির আশ্রয় লাভ করিয়াছে, ইহা তাহার সম্পত্তি।

কৈশোর অতীত হইল, ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ক্রমে গৌরীগঙ্গা

গ্রামে আমার অনেক উপাসক জুটিল। তখন পিতা মাতা আমার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই যে, আমার অবস্থান্তর হইয়াছে।

পর্ব্বতবাসী চিরদরিদ্র, গ্রামে আমার পিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনী। আর এক ধনী ছিল, সে বণিক্। তাহার একমাত্র পুত্র সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে কামনা করিত, তাহারই তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আমার আশা ভরসা জলিয়া গিয়াছে। আমি যখন শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া স্থিরনেত্রে বর্ষাজলস্ফীত নির্ঝরিণীর নিপুণা নর্ত্তকীসুলভ গতি দেখিতাম। তখন সহসা পশ্চাতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস শব্দে চমকিয়া উঠিতাম। দেখিতাম, দূরে চীরগাছের পার্শ্বে নয়নসিংহ পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া আছে। গৌরীগঙ্গার জলে নামিয়া যখন জলপথে চলিতাম, তখন দেখিতাম, দূরে বাণবনের অন্তরালে থাকিয়া নয়নসিংহ আমার অনুসরণ করিতেছে। যদি কখনও নদীতীরে স্বচ্ছজলে আমার প্রতিবিম্ব দেখিতাম, তখনই দেখিতে পাইতাম যে পশ্চাতে তাহার তৃষ্ণাকাতর নয়নযুগ্ম আমার দিকেই চাহিয়া আছে। তখনও আমি কিছু বুঝিতে পারিতাম না।

বয়সের সহিত সাহস বাড়িল, ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়া বহুদূরে যাইতে আরম্ভ করিলাম। কখনও কখনও উপরে উঠিয়া রেলের ধারে বসিয়া থাকিতাম, সারাদিন রেল দেখিতাম।

গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইত, কিন্তু সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে কখনও কোনও দিন আমার ভয় করিত না। আমি জানিতাম যে, নয়নসিংহ সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে আছে, এবং সে থাকিতে আমার কোনও ভয় নাই। আমার সখীরা আমাকে বিদ্রূপ করিত, সকলেই বলিত যে নয়নসিংহ মায়াকে বিবাহ করিবে। আমি তখন সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতাম না। বিবাহ কি জানিতাম না, জানিতেও চাহিতাম না। পিতৃগৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে একথা মনে হইলেও শিহরিয়া উঠিতাম।

একদিন এই পথের ধারে দেবদর্শন মিলিল। তখন ষ্টেশন নূতন হইয়াছে, এক জন শ্বেতশ্মশ্রুধারী কৃষ্ণকায় বৃদ্ধ ষ্টেশনমাষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। আমি তখন সারাদিন পথের ধারে প্রাচীরের উপরে বসিয়া গাড়ী দেখিতাম, নয়নসিংহ উপরে আর নীচে গুলেল দিয়া পাখী মারিয়া বেড়াইত। ষ্টেশনমাষ্টার বাবু শীতের ভয়ে ঘর হইতে বাহির হইতেন না। রাত্রিতে একা থাকিতে তাঁহার ভয় করিত, কারণ তখন খালাসীরা ষ্টেশনে থাকিত না। একদিন নয়নসিংহকে গুলেল দিয়া পাখী মারিতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন যে, বড় বীর। তখনই তিনি তাহাকে চাকরি দিবার প্রস্তাব করিলেন। নয়নসিংহ আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে চাকরী

করিবে কি না? নয়নসিংহ চাকরি করিবে কি না তাহাতে কাহার কি যায় আসে? আমি বলিলাম, "যাও।"

পরদিন নয়নসিংহ সাতটাকা বেতনে ষ্টেশনমাষ্টার বাবুর দরওয়ান নিযুক্ত হইল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সে আমাকে গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আবার ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিত।

একদিন ঝরণার কাছে রাস্তার ধারে প্রাচীরের উপর বসিয়া আছি, কলিকাতার গাড়ী তখনও আসে নাই, হঠাৎ দেখিলাম ঝরণার পথে, একখানা বড় পাথরের উপর কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া আমার শরীরে রোমাঞ্চ হইল, আমি যেন কেমনতর হইয়া গেলাম! তাঁহার বেশ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত বটে, কিন্তু রূপ দেবতার মত। বরফের মত শুভ্র কখনও মানুষের বর্ণ হয়? ইংরেজ সাদা, কিন্তু সে বর্ণ ত এমন নয়, সে যেন ধবল রোগের বর্ণ। কিন্তু আমার দেবতার বর্ণ মধুর, মনোহর, তাহাতে তীব্রতা নাই। এমন বর্ণ, এমন ভ্রমর-কৃষ্ণকেশ, এমন সুন্দর মুখ কখনও মানুষের হয়? সেইজন্যই আমার ধারণা হইয়াছিল, আমি মানুষ দেখি নাই, দেবতা দেখিয়াছি। যখন চমক ভাঙ্গিল তখন দেখিলাম; ঝরণার গর্ভে কেহ নাই। সেইদিন সন্ধ্যাকালে

গ্রামে ফিরিবার সময় নয়নসিংহ বলিল যে, বুড়া বাবুর অনেক আত্মীয় স্বজন আসিয়াছে।

তাহার পরদিন কে যেন আমাকে টানিয়া ঝরণার ধারে লইয়া গেল, সারাদিন সেই পাথরের উপর বসিয়া রহিলাম, কিন্তু কেহই আসিল না, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। যখন ফিরিলাম তখন আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আমায় উপরে উপদেবতার নজর হইয়াছে বলিয়া আমার ভাই পরদিন তারাদেবীর মন্দিরে পূজা দিয়া আসিল।

পরদিন আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। তখন বর্ষা কাটিয়া গিয়াছে, নীল আকাশ পরিষ্কার, আবার ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেবদর্শন মানসে আমি সেদিন প্রাতঃস্নান করিয়া রাশি রাশি ফুল তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। কতকগুলা ফুল মাথায় ও কাণে গুঁজিয়াছিলাম, আর বাকী গুলা কাপড়ে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। সেদিন তিনি পথের ধারে দাঁড়াইয়া নির্ঝরিণীর নৃত্য দেখিতেছিলেন। দেবদারুর সুগন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছিল, উপর পাহাড়ে তুষার-রাশির উপর রৌদ্র পড়িয়া তাহা সোণার বরণ হইয়া গিয়াছিল। আমি দূর হইতে প্রণাম করিয়া আমার অর্ঘ্য তাঁহার পায়ের কাছে ছড়াইয়া দিলাম, তখনই ঘুর্ণবায়ু উঠিয়া ছোট ছোট ফুলগুলি তাঁহার চারিদিকে উড়িতে লাগিল। ভয়ে ও ভক্তিতে

আমি আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?"

দেবতার সঙ্গে কি কেহ কথা কহিতে পারে ? আমি হাতযোড় করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি অনেকক্ষণ আমাকে দেখিলেন, পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?" আমি কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, "মায়া।" সেই প্রথম আলাপ। সেইদিন হইতে আমি তাঁহার হইলাম, একমুহূর্ত্তে পিতা, মাতা, ভ্রাতা সমস্তই বিস্মৃত হইলাম।

প্রত্যূষে গ্রাম ছাড়িয়া উপরে উঠিতাম। যতক্ষণ ষ্টেশ-নের দুয়ার না খুলিত, ততক্ষণ রাস্তার ধারে বসিয়া থাকিতাম। তিনি দুয়ার খুলিলে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির হইতাম। পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে উপত্যকায় নির্ঝরিণীর পাশে পাশে, বহুবর্ণের উপলরঞ্জিত নদীবক্ষে সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াই-তাম, ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে থাকিত না। তিনি থলিয়ায় ভরিয়া আহার্য্য লইয়া যাইতেন, পথে নির্ঝরিণীর পার্শ্বে, অথবা নদীকূলে বসিয়া তিনি আহার করিতেন, পাত্রে যে উচ্ছিষ্ট অন্ন পড়িয়া থাকিত, আমি সানন্দে তাহা খাইয়াই দিন কাটাইয়া দিতাম। কোথা দিয়া যে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল, তাহা জানিতে পারিতাম না, কিন্তু নয়নসিংহ ক্রমে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল।

একদিন নয়নসিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে তাঁহার সহিত একা থাকিতে নিষেধ করিল। আমি হাসিয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিলাম। তাহাতে সে আরও রাগিয়া গেল এবং কুক্‌রী বাহির করিয়া বলিল, যে বাঙ্গালী তাহার শত্রু তাহাকে হত্যা করিবে। আমার বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম যে আমার মাথা কোলে লইয়া ঘোর কুয়াসার মধ্যে তিনি ভূমিতে বসিয়া আছেন, ষ্টেসনের দুইজন খালাসী নয়নসিংহকে ধরিয়া আছে। কলিকাতা হইতে গাড়ী আসিয়াছে, তাহা হইতে অনেক ইংরাজ বাঙ্গালী আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। পুলিস সেই গাড়ীতে নয়নসিংহকে দার্জ্জিলিঙ্গ লইয়া গেল, গাড়ী ছাড়িয়া গেল, তখনও আমি তাঁহার জানুর উপরে শুইয়া রহিলাম, আমার উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। গাড়ী ছাড়িয়া গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়া, নয়নসিং কি তোমাকে আঘাত করিয়াছিল?"

আমি বলিলাম "না।"

"তবে তুমি মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলে কেন?"

এইবার আমি বড় বিপদে পড়িলাম। লজ্জা আসিয়া আমার বাক্‌রোধ করিল। তিনি দুই তিনবার আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। লজ্জায় আমার

কর্ণমূল ও গণ্ডস্থল লাল হইয়া উঠিল, আমি উঠিয়া বসিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিলাম। তিনি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অন্য দিন নয়নসিংহ আমাকে গ্রামে দিয়া আসিত, আজ তিনি আমাকে লইয়া আসিলেন। গৌরীগঙ্গা গ্রামের সীমান্তে একটা বাণগাছের তলায় দাঁড়াইয়া তিনি আমার হাত দুইটী ধরিয়া বলিলেন, "আমাকে বিবাহ করিবে?" আমি লজ্জায় উত্তর দিতে পারিলাম না, কিন্তু তাঁহার নয়ন যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মায়া তুমি কি আমার হইবে?" তখন আর আমি থাকিতে পারিলাম না, তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

তাহার পরদিন তিনি আমাকে লইয়া খরসানে গেলেন, খরসানে আমাদের বিবাহ হইল। বিবাহের পরে তিনি আমাকে লইয়া দার্জ্জিলিঙ চলিয়া গেলেন। কয়েকদিন পরে তিনি রেলে চাকরি লইয়া এই টুঙ্গ ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন।

মা, এই গৃহ আমার স্বর্গ, আমার স্বামীর সহিত যে কয়মাস বাস করিয়াছিলাম তাহা স্বপ্নের মত, এখন তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এই গৃহ আমার জীবনের কেন্দ্র। মনের আবেগে কতদূর চলিয়া যাই, মনে করি আর আসিব না, কিন্তু কোন্ অদৃষ্ট শক্তির আকর্ষণে আবার এই পথের ধারের ক্ষুদ্র

গৃহে আমাকে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা বলিতে পারি না। এখন আর এ গৃহ আমার নয়, ইহাতে বাস করিবার অধিকার আর আমার নাই। সেইজন্য যখন আসি তখন দূরে লুকাইয়া দেখি, অবসর পাইলে গৃহবাসীদিগের সহিত আলাপ করি এবং সেই অছিলায় আমার এই পবিত্র তীর্থমন্দিরে প্রবেশ করি। তাহার পর কত ষ্টেশন মাষ্টার আসিল গেল, সকলেরই পরিবারের সহিত মাগিয়া যাচিয়া পরিচয় করিয়াছি। এখন যেমন সারাদিন তোমার গৃহে আসিয়া বসিয়া থাকি, তাদের সময়েও এমনই করিয়া এই তীর্থে আসিয়া দিন কাটাইতাম আর সন্ধ্যার সুখ স্বপ্ন স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রবল অন্ধকারময় পার্ব্বত্য-পথ দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতাম।

কত সুখে যে সে কয়মাস কাটিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। সে যে স্বপ্ন, ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, স্বপ্ন দূরে সরিয়া গিয়াছে, আছে কেবল তাহার স্মৃতি। যেদিন সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সে দিনটা এমনই। সে দিনও আকাশে মেঘ ছিল না, তরতর করিয়া দক্ষিণাবাতাস বহিতেছিল, পথের ধারে বন্য টিয়াপাখীগুলি তারের উপর বসিয়া কিচিমিচি করিতেছিল। আমি পথের ধারে বসিয়া তাঁহার জন্য মালা গাঁথিতেছি, এমন সময়ে কলিকাতার গাড়ী আসিল, আমি ঘরের ভিতর গিয়া লুকাইলাম। গাড়ী ছাড়িয়া গেলে তিনি একখানি পত্র লইয়া ঘরের

ভিতরে আসিলেন এবং শয্যার উপরে বসিয়া পড়িলেন। ঐ সেই খাট, ঐ জানালা, এই সেই আমি, ঐ সেই অনন্ত পর্ব্বত-শ্রেণী আর অনন্ত নীল আকাশ—সমস্তই আছে, নাই কেবল তিনি, আর আমার সে দিন। এই গৃহের প্রতি ইষ্টক ও কাষ্ঠখণ্ড তাহার সাক্ষী।

পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁহার নয়নকোণ হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, তাহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাঁহার মুখে কেবল হাসি দেখিয়াছি, কখনও সে নয়ন-কোণে অশ্রুবিন্দু দেখি নাই। পত্রপাঠ শেষ হইলে তিনি চক্ষু মুছিয়া আমায় বলিলেন, "মায়া পড়, যাহা হইয়াছে তাহা ফিরিবার নহে। তোমাকে ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করিয়াছি, কেমন করিয়া ত্যাগ করিব।" এই সময় খালাসী আসিয়া বলিল যে কলিকাতার মালগাড়ী আসিয়াছে। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে গেলেন, আমি পত্র লইয়া পড়িতে বসিলাম।

তিনি আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। পত্র তাঁহার পিতার :—

"যেদিন শুনিলাম যে রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া তুমি বংশ গৌরব ও শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া নীচ পাহাড়ীর কন্যা বিবাহ করিয়াছ, সেইদিন হইতে তুমি আর আমার পুত্র নহ। আমি জানিয়াছি যে আমার পুত্র হিমালয় ভ্রমণ করিতে গিয়া মরিয়াছে।

তোমার গর্ভধারিণীকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহা পারি নাই। সে অভাগিনী রমণী, সুতরাং কোমল-হৃদয়া, সে তোমাকে ভুলিতে পারে নাই। তোমার জন্য আজি সে মৃত্যুশয্যায়, সে তোমাকে দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিল তাহার উপর যদি তোমার ভক্তি বা মমতা থাকে তাহা হইলে একবার তাহাকে দেখা দিয়া যাইও। আমার গৃহে আসিও না, যদি পাহাড়ীর কন্যাকে ত্যাগ করিতে পার তাহা হইলে আমার গৃহে প্রবেশ করিও, নতুবা নহে।

তোমার পিতা"

পত্র পড়িয়া মন কেমনতর হইয়া গেল। আমার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমার জন্য তাঁহার মাতা মৃত্যুশয্যায়, আমার জন্য তিনি ঘৃণিত, অপমানিত, দেশ-ত্যাগী, পিতৃগৃহে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই! এসকল কথা ত পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই! আমার স্বর্গ যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, আবার সুখস্বপ্ন ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিক অন্ধকার বোধ হইল, ধীরে ধীরে গৃহের বাহির হইয়া, পথের ধারে পাথরের উপর বসিয়া পড়িলাম।

তিনি দেবতা, দয়া করিয়া চরণে স্থান দিয়াছিলেন মাত্র, আমার পূজা করিবার অধিকার আছে। আমার জন্য তিনি সর্ব্বত্যাগী, পিতৃগৃহে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাঁহার মাতা মৃত্যু-

শয্যায় একবার তাঁহাকে দেখিতে চাহেন। তিনি বলিয়াছেন, "যাহা হইয়াছে তাহা ফিরিবার নহে।" বার বার কেবল এই কথাই আমার মনে উদয় হইতে লাগিল, পথের ধার ছাড়িয়া ঝরণার ধারে গিয়া বসিলাম।

কেন ফিরিবার নহে! যাহা হইয়াছে তাহা স্বচ্ছন্দে ফিরিবে। আমার সুখের জন্য, তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী করিয়া রাখিব, তাঁহাকে চিরজীবন অশান্তি ভোগ করিতে হইবে, তাঁহার পিতা মাতাকে একমাত্র পুত্র ত্যাগ করিয়া থাকিতে হইবে? ছি, হঠাৎ হাসি আসিল, পাথরের ধারে কতকটা জল জমিয়াছিল, তাহাতে আমার প্রতিবিম্ব দেখিলাম। দেখিলাম, চোখে জল মুখে হাসি।

তিনি না আমার দেবতা? আমি না তাঁহার দাসী? আমার জন্য তিনি স্বজনসমাজে হেয় হইয়া থাকিবেন! এ আমার কেমন উপাসনা? এ আমার কেমন ধরণের পূজা? আমি না হিন্দুর কন্যা? গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলাম। লিখিতে লিখিতে চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল, পত্রের কালি কতস্থানে ধুইয়া গেল। পত্র শেষ হইলে তাহা তাঁহার মেজের উপরে রাখিয়া আমার ভূস্বর্গ ত্যাগ করিলাম। তিনি তখন পথের ধারে পাথরের উপরে বসিয়া একমনে চিন্তা করিতেছিলেন, বোধ হইল দেশের

কথা, সমাজের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা—আমার হাসি আসিল।

দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মনে মনে বলিলাম, "দেবতা আমি চলিলাম, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাইও, পিতামাতার নিকটে যাইও। নিশ্চিন্ত মনে স্বজন সমাজে ফিরিও। তুমি সুখী হইও, আমার জন্য ভাবিও না, দুঃখ করিও না, তোমার সুখে আমার সুখ, তুমি যে আমার দেবতা। আমার জন্য তুমি সমাজ ত্যাগ করিয়াছিলে, স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলে, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এত-দিন সে কথা আমাকে বুঝাইয়া বল নাই কেন? তাহা হইলে কি তোমার নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিতে দতাম! দেবতা, তুমি হাসিও, কেহ যেন কখনও তোমার মুখখানি মলিন না দেখে, তোমার নয়নকোণে যেন আর কখনও অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া না পড়ে, তুমি সুখী হইও, তাহা হইলে আমি স্বর্গে যাইব। তুমি আমার দেবতা, তুমি স্বর্গ, তুমি চিন্তা, তুমি ধ্যান! যখন পাষাণের আঘাতে এ দেহ চূর্ণ হইবে, তখন যেন মানস চক্ষে তোমার মুখখানি দেখিতে দেখিতে মরি।

প্রণাম করিয়া উঠিলাম। দূরে পর্ব্বতশৃঙ্গে একখানা বড় পাথর ছিল, তাহার উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে

মানুষ বাঁচে না। ধীরে ধীরে অপরের অলক্ষ্যে সেই পাথরের উপরে উঠিলাম, হাত পা কাপড় দিয়া দৃঢ় করিয়া বাঁধিলাম। মরণের দুয়ারে গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, তখন আবার কে আমাকে ফিরাইয়া আনিল। হঠাৎ মনে হইল আর ত দেখিতে পাইব না, একবার দেখিয়া আসি। ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম যে তখনও তিনি সেইভাবে সেই পাথরের উপরে বসিয়া আছেন।

ফিরিয়া গেলাম। হঠাৎ জীবনে বড় মমতা হইল, মনে হইল বাঁচিয়া থাকি, মরিয়া কাজ নাই, তবুও ত কখনও কোনও দিন অন্ততঃ একবার চোখে দেখিতে পাইব। আমি জানিতাম পাইব। আমি জানিতাম যে আমি বাঁচিয়া থাকিতে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, আমি তাঁহার জীবন-পথের কণ্টক, সুখের অন্তরায়, সেইজন্য আমি স্থির করিলাম যে আমি মরিব, অথচ বাঁচিয়া থাকিব, জানিবেন যে আমি মরিয়াছি অথচ আমি জীবিত থাকিব। সেই পাথরের উপরে ফিরিয়া গেলাম, তাহার উপরে আমার অলঙ্কার গুলি খুলিয়া রাখিলাম, একখানা বড় পাথরে আমার বস্ত্র জড়াইয়া নিম্নে নিক্ষেপ করিলাম। তাহার পর ঝরণার জলে পা দিয়া বনের ভিতরে লুকাইলাম। তখনও আমার পিতামাতা বাঁচিয়া ছিলেন, সেখানেও গেলাম না, কোন গ্রামেও যাই নাই। টুঙ্গের উপরে একটা গুহা আছে, সেখানে নয়নসিংহ একরাত্রি যাপন করিয়াছিল,

চলিয়া গেলেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, মনে বড় ভয় হইয়াছিল পাছে তিনি চিনিয়া ফেলেন। তখন আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল, শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতেছিল। তখন যদি তিনি আমাকে স্পর্শ করিতেন তাহা হইলে আমি হয়ত আত্মসম্বরণ করিতে পারিতাম না। তিনি চিনিতে পারিলেন না, তিনি চলিয়া গেলেন, আমার মনের আবেগ ধীরে ধীরে প্রশমিত হইল। হঠাৎ দূরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম, কে যেন দ্রুতপদে আমার দিকে আসিতেছে।

সে তিনি। তিনি আকুল কণ্ঠে ডাকিতেছেন, "মায়া, মায়া, এইবার চিনিয়াছি মায়া, ফিরে এস মায়া।" সহসা মনে বল ফিরিয়া আসিল, আমি অন্ধকারে লুকাইলাম। দর্শন মিলিয়াছে, একযুগ পরে তাঁহাকে দেখিয়াছি, ইহাই কি যথেষ্ট নহে? তাঁহার আকুল কণ্ঠের আহ্বান চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পাছে মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে সেই ভয়ে দুই হাতে বক্ষস্থল ধরিয়া রহিলাম। যদি ধরা দিই তাহা হইলে সমস্ত ব্যর্থ হইবে। মন বাঁধিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে তিনি যখন চলিয়া গেলেন, তখন গৃহে ফিরিলাম।

তাহার পরে সাবধানে পথ চলিতাম, দূর হইতে তাঁহাকে

দেখিতে পাইলে, অন্যপথে চলিয়া যাইতাম। সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম যে তাঁহার নয়ন দুইটি সতত আমাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। তাহা দেখিয়া আমার মন বলিল, তিনি জানিয়াছেন আমি মরি নাই, বাঁচিয়া আছি। আমিও দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতাম, তাহাতেই আমি পরিতৃপ্ত হইতাম। ক্রমশঃ তাঁহার পরিচয় পাইলাম, তিনি একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহার যশ দেশে ও বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে! তিনি বিবাহ করিয়াছেন, তাহাতে দোষ কি? তিনি ত জানিতেন যে আমি নাই, আমি মরিয়াছি।

আরও দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন যৌবন অতীত হইয়াছে, জরা আসিয়া স্পর্শ করিয়াছে। পিতার মৃত্যু হইয়াছে, ভ্রাতারা সৈনিক, তাহারা দেশত্যাগ করিয়াছে, আবার আসিয়া গৌরীগঙ্গায় বাস করিয়াছি। প্রতি বৎসর তিনি দার্জ্জিলিঙে আসেন, তখন আমিও সেখানে যাই। দূর হইতে তাঁহাকে দেখি, তাহাতেই তৃপ্তি হয়। এখনও মনে বড় ভয় হয়, যদি তিনি স্পর্শ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে হয় ত আত্মসম্বরণ করিতে পারিব না, আমার দেহের সমস্ত অণু পরমাণু বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। তখন যৌবনে যেমন আত্মহারা হইয়া তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইতাম, এখনও তেমনি করিয়া তাঁহার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ফেলিব। ছি—"

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই পার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—"বহিন্, আমরাও হিন্দুর মেয়ে, সকলেই একদিন না হয় একদিন স্বামী-পুত্র লইয়া বসবাস করিয়াছি, কিন্তু আমরা কয়জনে স্বামীর সুখের জন্য এমন করিয়া আত্ম-জলাঞ্জলি দিতে পারি? আমি ত পারি না।"

সম্পূর্ণ

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালা-দেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে ; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লী-সমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ এবং ধর্ম্মপাল, বড়বাড়ী, কাঞ্চনমালা, দূর্ব্বাদল ও অরক্ষণীয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজের' স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করুন